ভারতের খনিজ

রাজশেখর বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ম ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত

। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়

ভারতের খনিজ

রাজশেখর বসু

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১ কার্তিক ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৫১

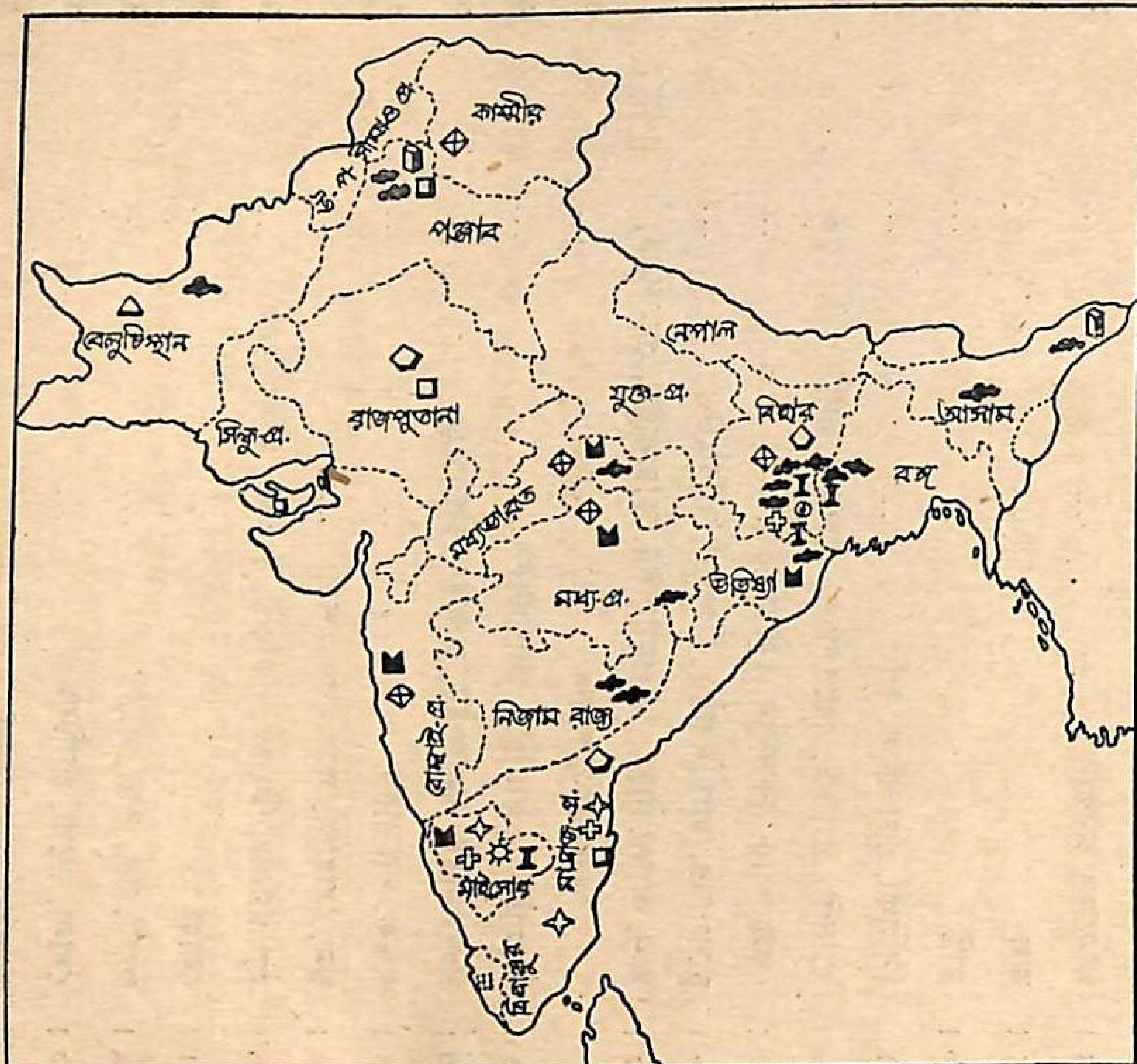
মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা
=৩২'০—১.১১.৪৪

এই পুস্তকের জন্য তথ্যসংগ্রহে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায় এম. এস-সি, শ্রীযুক্ত সুকুমার বসু বি. এস-সি (ডারহাম), শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী এম. এস-সি, এবং শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন এম. এস-সি নানারকমে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

২৭-৬-৪৩ রাজশেখর বসু

প্রকরণসূচী



থনিজের অবস্থান

- অভ্র
- কয়লা
- ক্রোমাইট
- গন্ধক
- তামা
- নুন
- মনাজাইট
- ম্যাংগানিজ
- ম্যাগনিসাইট
- পেট্রোলিয়ম
- বকসাইট
- লোহা
- সোনা

১। ভূমিকা

Mineral শব্দের মৌলিক অর্থ — যা mine বা খনি থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে এর অর্থ — স্বভাবজাত অজৈব (inorganic) বস্তু, যেমন মাটি বালি পাথর অভ্র সোনা হীরে ইত্যাদি। এই অর্থে mineralএর প্রতিশব্দ 'খনিজ'। কাঠ হাড় জৈব (organic) বস্তু, ইট কাচ মানুষের তৈরি, সেজন্য এসব বস্তু খনিজ নয়। যে বস্তু মূলত উদ্‌ভিজ্জ বা প্রাণিজ কিন্তু বহুকালব্যাপী প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় অত্যন্ত বদলে গেছে তাকেও খনিজ বলা হয়। যেমন পাথুরে কয়লা, যার উৎপত্তি অতি প্রাচীন যুগের গাছপালা থেকে; খড়ি (chalk) এবং কয়েকপ্রকার চুনেপাথর (limestone), যা জলজ প্রাণীর কঙ্কাল থেকে উৎপন্ন হয়েছে; শালগ্রাম শিলা, যা একরকম অতিপ্রাচীন শামুক-জাতীয় (ammonite) জীবের শিলীভূত পরিণাম। কেরোসিন পেট্রল প্রভৃতির মূল বস্তু পেট্রোলিয়মও খনিজ। ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন এর উৎপত্তি জৈব পদার্থ থেকে, কিন্তু সেই আদি পদার্থ উদ্‌ভিদ কি প্রাণী তা এখনও নিঃসন্দেহে স্থির হয় নি।

'তৈল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যা তিল থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রচলিত অর্থটি ব্যাপক, সরষের তেল, তার্পিন, কেরোসিন সবই তৈল। বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'খনিজ' শব্দেরও একটু ব্যাপক অর্থ ধরতে হবে। খনিজ মাত্রই খনি থেকে খুঁড়ে বার করতে হয় এমন নয়। অনেক স্থানে ভূমির উপরেই খনিজ পাওয়া যায়। মাটি এবং জলও খনিজ ব'লে গণ্য হয়।

Mineral শব্দের আর একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক অর্থ আছে, যথা— স্বভাবজাত অজৈব বস্তু যার রাসায়নিক উপাদান ও গঠন সুনিয়ত এবং অবস্থাবিশেষে যা

কেলাসিত (crystallized) হয়, অর্থাৎ স্ফটিকের বা চিনির দানার মতন জ্যামিতিক আকার পায়। যেমন—স্ফটিক (rockcrystal), অভ্র (mica), আকরিক নুন (rocksalt)। ইংরেজী mineral শব্দের নকলে খনিজ শব্দের দুই অর্থ করবার দরকার নেই। শেষোক্ত অর্থে mineralএর প্রতিশব্দ 'মণিক'। মণিকের আলোচনা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়।

উপরে যে সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে তাতে বোঝা যাবে যে মণিক মাত্রই খনিজ, কিন্তু খনিজ মাত্রই মণিক নয়। কলকাতার রাস্তা যে পাথর দিয়ে বাঁধানো হয় তার নাম ব্যাস্ট বা ট্র্যাপ (basalt, trap)। এই পাথর খনিজ, কিন্তু বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন সেজন্য মণিক নয়।

খনিজবস্তু অসংখ্যপ্রকার। ভারতেও অনেক রকম পাওয়া যায়, তার মধ্যে যেগুলি কাজে লাগে কেবল সেইগুলিই আমাদের আলোচ্য। এই পুস্তকে খনিজের প্রাকৃতিক বিবরণের সঙ্গে তার প্রয়োগ এবং তজ্জাত অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলা হয়েছে। সেকালে এদেশে যতরকম খনিজের প্রয়োগ জানা ছিল তার তুলনায় এখন বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে অনেক বেশী রকম খনিজ কাজে লাগানো হচ্ছে। অনেক খনিজের দেশী নাম পর্যন্ত নেই। কতকগুলির স্থানীয় নাম থাকলেও তা বহুপ্রচলিত নয়। সেজন্য অধিকাংশ খনিজের ইংরেজী বা ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক নামই বাংলায় চালাতে হবে।

ইংরেজী ১৯৩৮ সালে ভারতে যত খনিজ তোলা হয়েছিল তার মোট মূল্য ৩৪ কোটি টাকার উপর। অনেক খনিজ কাঁচা মাল হিসাবেই বিদেশে চালান যায়। ভারতবাসীর স্বত্ববোধ তীক্ষ্ণ নয়, স্বত্বরক্ষার সামর্থ্যও কম, সেজন্য অনেক আকরের ইজারা বিদেশীর হাতে গেছে। এদেশের লোকে ধান পাট সরষে গম আক কাপাস প্রভৃতি বোঝে, পাথুরে কয়লাও কিছু বোঝে, কিন্তু বকসাইট ম্যাংগানিজ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের কোনও জ্ঞান নেই, ধনী ভূস্বামীরও বিশেষ কৌতূহল নেই। যাঁরা ভূবিদ্যায় শিক্ষিত তাঁরাও অবস্থাগতিকে নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র হয়ে আছেন। যদি বিষয়বুদ্ধি, অর্থবল, এবং খনিকর্মে ও খনিজতত্ত্বে অভিজ্ঞতার

সমবায় ঘটে তবেই খনিজের সংপ্রয়োগ হ'তে পারে। এই সমবায় এদেশে এখনও দুর্ঘট, তথাপি আশার কথা এই, যে দেশের শিক্ষিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের দৃষ্টি ক্রমশ এদিকে পড়ছে এবং তার ফলে কয়েক স্থানে দেশী খনিজ থেকে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনের আয়োজন হয়েছে।

কৃষি মানুষের আয়ত্ত, সেজন্য শস্যাদি প্রচুর খরচ করলেও পুনরুৎপাদনের উপায় আছে, কিন্তু খনিজদ্রব্যের কণামাত্র সৃষ্টির ক্ষমতা কারও নেই। সভ্যতাভি-মানী জাতিরা অপব্যয়ী ধনিসন্তানের মতন জগতের খনিজসম্পদ এতদিন বেপরোয়া খরচ করেছে, ফুরিয়ে গেলে কি হবে তা ভাবে নি। বিগত এবং বর্তমান যুদ্ধে লোহা তামা নিকেল রাং কয়লা পেট্রোলিয়ম প্রভৃতির যে অপচয় হয়েছে এবং হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য কতকগুলি খনিজের ভাণ্ডার অতি বিপুল, হয়তো মানবজাতির আয়ুকালের মধ্যে নিঃশেষ হবে না, কিন্তু অনেক খনিজ অল্পই পাওয়া যায়। এর মধ্যেই আমেরিকায় তৈলাভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, অনেক দেশের বড় বড় কয়লার খনি রিক্ত হয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের দূরদর্শী বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন — সময় থাকতে সতর্ক হও, অপচয় বন্ধ কর, যথাসম্ভব দুর্লভ বস্তুর পরিবর্তে সুলভ বস্তু দিয়ে কাজ চালাও। এদেশে যেসব আকর আছে তার উপর দেশবাসীর কর্তৃত্ব অতি অল্প, তথাপি এখনই জনসাধারণের অবহিত হওয়া কর্তব্য। এদেশের প্রতি যাদের মমতাবোধ নেই তারা আকরের অধিকার পেয়ে ভবিষ্যৎ ভেবে সংযমী হবে না, তাদের স্বার্থ তাড়াতাড়ি যত পারে আদায় ক'রে নেওয়া। সুতরাং ভারতবাসীর নিজ সম্পত্তির অবস্থান আর পরিমাণ সত্বর বুঝে নিতে হবে, এবং যতদিন স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন লুণ্ঠনে আর অপব্যয়ে যথাসাধ্য বাধা দিতে হবে।

২। শিলার শ্রেণীভেদ

ইংরেজী ভূবিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে rock শব্দটি প্রসারিত অর্থে চলে। বাংলায় তার প্রতিশব্দ ধরা হয়েছে — 'শিলা'। শিলার অর্থ শুধু পাথর নয়, প্রাকৃতিক

ক্রিয়ায় উৎপন্ন পুঞ্জীভূত খনিজপদার্থ মাত্রই শিলা, যেমন পাথর, কয়লার স্তর, বালি পলিমাটি বা কাদার স্তর।

অনেক শিলা অত্যন্ত প্রাচীন — বহু কোটি বৎসর পূর্বে উৎপন্ন। পৃথিবী যখন সূর্য থেকে ছিটকে এসে স্বতন্ত্র হয় তখন তার দেহ তরল বা বায়ব ছিল, তার পর ক্রমশ তাপ ক'মে যাওয়ায় উপরের অংশ কঠিন হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে নীচে প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত বিবিধ নূতন ও পুরাতন শিলায় গঠিত। তার নীচে যা আছে তা অতি তপ্ত, কিন্তু শক্ত কি নরম তা স্থির হয় নি। এই আভ্যন্তরিক পদার্থ খুব ভারী, সম্ভবত লোহা নিকেল প্রভৃতি ধাতুতে গঠিত। ভূমির যত নীচে নামা যায় ততই তাপ বাড়ে। আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণপ্রস্রবণ এই অন্তস্তাপের লক্ষণ। ভূপৃষ্ঠের অনেক শিলা ক্রমশ বাতাস বৃষ্টি জলপ্রবাহ তুষার প্রভৃতির প্রভাবে বিশ্লিষ্ট ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তার পর আবার কোনও প্রাকৃতিক বিপ্লবের উলটপালটের ফলে নীচে নেমে গিয়ে প্রচণ্ড উত্তাপ ও চাপের প্রভাবে অন্য আকার পেয়েছে। শুধু একরকম শিলা থেকে অন্যরকম শিলা উৎপন্ন হয়েছে এমন নয়, বিবিধ উদ্‌ভিদ প্রাণিকঙ্কাল প্রভৃতি জৈব বস্তুও শিলায় পরিণত হয়েছে, যেমন পাথুরে কয়লা, খড়ি। এইসব পরিবর্তন বহু কোটি বৎসরে ক্রমে ক্রমে হয়েছে। আবার অনেক শিলা অত প্রাচীন নয়, অনেকের বয়স কয়েক সহস্র বা কয়েক শত বা কয়েক বৎসর মাত্র, যেমন নদীর পলিমাটির স্তর।

উৎপত্তি অনুসারে শিলা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।— (১) আগ্নেয় শিলা (igneous rock), যা উত্তপ্ত তরল অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে জ'মে কঠিন হয়েছে, যেমন গ্র্যানিট, ব্যাস্‌ট। (২) পাললিক শিলা (sedimentary rock), যা চূর্ণ বস্তু মিশ্রিত বা ঘোলা জল থেকে থিতিয়ে স্তরাকারে জমা হয় এবং অনেক স্থলে অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশ্রণের ফলে শক্ত হয়ে যায়, যেমন বালির স্তর থেকে উৎপন্ন বেলেপাথর (sandstone), রাসায়নিক ক্রিয়ায় বা প্রাণিবিশেষের কঙ্কালরাশি থেকে উৎপন্ন চুনেপাথর (limestone), কাদার স্তর থেকে উৎপন্ন

শেল (shale)। (৩) রূপান্তরিত শিলা (metamorphic rock), যা মূলত পাললিক বা আগ্নেয়, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাপ ও চাপের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, যেমন চুনেপাথর থেকে উৎপন্ন মারবেল, শেল থেকে উৎপন্ন স্লেট। আগ্নেয় শিলা যখন তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে কঠিন হয় তখন তার অনেক উপাদান কেলাসিত হয়, অর্থাৎ মিছরি বা চিনির মতন দানা বাঁধে। যদি তরল শিলা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে জমে তবে দানা ছোট হয়, যদি ধীরে ধীরে জমে তবে দানা বড় হয়। পাললিক শিলা উৎপত্তির সময় জলের সমান্তরাল ভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়, কিন্তু পরে ভূমির উত্থান-পতনের জন্য অনেক স্থলে স্তর বেঁকে যায়, ভাঁজ হয়, অথবা ভেঙে যায়। আগ্নেয় শিলা পাললিকের মতন স্তরিত হয় না। রূপান্তরিত শিলায় অনেক স্থলে পূর্বের পাললিক স্তর বজায় থাকে এবং উত্তাপে গ'লে যাওয়ার ফলে অবস্থাবিশেষে কেলাসিত হয়। পাললিক শিলায় কেলাস উৎপন্ন হয় না।

৩। ভূসংস্থান

কোথায় কোন্ অবস্থায় কিরকম খনিজ পাওয়া যায় তার বিবরণের আগে ভারতবর্ষের ভূমির উৎপত্তি, প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। সংক্ষেপে তার আলোচনা করছি।

ভারতের উত্তর অংশের নাম আর্যাবর্ত, দক্ষিণ অংশের নাম দক্ষিণাপথ (Deccan)। এই বিভাগ প্রাচীন কাল থেকে প্রসিদ্ধ আছে এবং এই দুই অংশের প্রাকৃতিক প্রভেদও সুস্পষ্ট।

মনুসংহিতায় একটি শ্লোকে আর্যাবর্তের উত্তম বিবরণ দেওয়া আছে—

> আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ।
> হিমবদ্‌বিন্ধ্যয়োর্মধ্যমার্যাবর্তং প্রচক্ষতে ॥

অর্থাৎ পূর্বসমুদ্র থেকে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত এবং হিমবান্ ও বিন্ধ্য পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে আর্যাবর্ত বলা হয়। ভারতের উত্তরবর্তী হিমালয় গিরিশ্রেণীর শাখা পূর্বে

আসামের প্রান্ত দিয়ে নেমে আরাকানের কাছে বঙ্গোপসাগরে ঠেকেছে, এবং পশ্চিমে আফগানিস্থান বেলুচিস্থানের প্রান্ত দিয়ে নেমে করাচির উত্তরে আরবসাগরে পৌঁছেছে। কালিদাসও হিমালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন—'পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ'—পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন ক'রে আছে। হিমালয় একটিমাত্র শ্রেণী নয়, সাতনর হারের মতন তিব্বত থেকে উত্তরাখণ্ড পর্যন্ত পরে পরে বিন্যস্ত কতকগুলি শ্রেণীর সমষ্টি। শিবালিক গিরিশ্রেণী — যার পাদদেশে হরিদ্বার — হিমালয়ের সর্বদক্ষিণ অংশ। আধুনিক ভূবিদ্যায় হিমালয়প্রদেশকে আর্যাবর্তের সমভূমি থেকে পৃথক্ ধরা হয়।

আর্যাবর্তের দক্ষিণসীমার গিরিশ্রেণী হিমালয়ের মতন একটানা নয়। এই সীমায় বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীই প্রধান, তা ছাড়া বিন্ধ্যেরই অংশস্বরূপ আরও অনেক পর্বত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, যেমন মির্জাপুর গয়া মানভূম সিংহভূম ছোটনাগপুর সাঁওতাল-পরগনা বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের পাহাড়। প্রাকৃতিক লক্ষণ অনুসারে দক্ষিণ-যুক্তপ্রদেশ, দক্ষিণ-বিহার এবং পশ্চিম-বঙ্গের পার্বত অঞ্চল দক্ষিণাপথের অন্তর্গত, কিন্তু পর্বতবর্জিত সমতল বঙ্গ আর্যাবর্তের অংশ।

দক্ষিণাপথ ত্রিভুজাকার। উত্তরে বিন্ধ্য এবং অন্যান্য বিক্ষিপ্ত পর্বত, বিন্ধ্যের কিছু নীচে প্রায় সমান্তরাল সাতপুরা গিরিশ্রেণী। পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমায় সমুদ্র। পূর্বপ্রান্তে পূর্বঘাট পর্বতমালা, তার মাঝে মাঝে ফাঁক। এই বিচ্ছিন্ন পর্বতমালার প্রাচীন নাম মহেন্দ্র। পশ্চিম প্রান্তে প্রায় একটানা পশ্চিমঘাট পর্বত বা সহ্যাদ্রি। দক্ষিণে এই দুই ঘাটপর্বত মিশে নীলগিরি নাম পেয়েছে। দক্ষিণাপথ মোটের উপর আর্যাবর্তের সমভূমির চেয়ে উঁচু এবং তাতে অনেক পাহাড় আর মালভূমি ছড়িয়ে আছে।

ভূবিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করেছেন যে অতি পুরাকালে হিমালয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না, আর্যাবর্ত, তিব্বত, বর্মা এবং চীনের একটি বৃহৎ অংশ এক বিশাল সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল। এই সমুদ্র — যার নাম দেওয়া হয়েছে টেথিস (Tethys) — পশ্চিমেও অনেকদূর বিস্তৃত ছিল, এবং এখনকার ভূমধ্যসাগর এরই একটা ক্ষুদ্র

অংশ। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত তখনও বর্তমান ছিল, এবং দক্ষিণ ভারত, আরবসাগর, আফ্রিকা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, মায় অস্ট্রেলিয়া — সমস্ত মিলে এক মহাদেশ ছিল, যার নাম গণ্ডোআনাল্যাণ্ড (Gondwanaland)। কালক্রমে এই মহাদেশের অনেক অংশ সাগরে নিমগ্ন হওয়ায় দক্ষিণ ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর সাইবিরিয়া ও দক্ষিণ ভারতের ভূমি অতি ধীরে ধীরে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে, এবং তার ফলে মধ্যবর্তী টেথিস-সমুদ্রের গর্ভ ঠেলে ওঠায় বিশাল হিমালয় পর্বতমালা এবং তিব্বতের উচ্চ মালভূমি উদ্ভূত হয়েছে। একটা মাদুরের উপরে কিছু তফাত ক'রে দুখানা ভারী বই রেখে যদি দুদিক থেকে ঠেলা হয় তবে মাঝের মাদুরের অংশটি দুমড়ে উঁচু হয়ে ওঠবে। হিমালয়ের উদ্ভব অনেকটা এইরকমে হয়েছে।

সপ্তম শতকের কাছাকাছি নর্মদার দক্ষিণ দেশে গোণ্ড জাতির রাজ্য ছিল। এই দেশের প্রাচীন নাম গণ্ডোআনা। এখানকার ভূমিতে কতকগুলি বিশেষ-প্রকার স্তর দেখা যায়, তাদের বলা হয় — গণ্ডোআনা পর্যায় (system)। এই স্তরবিন্যাস এবং তার অন্তর্নিহিত প্রাচীন জীবাশ্ম (fossil) অন্যত্রও দেখা গেছে এবং এই সাদৃশ্য থেকেই পুরাকালীন গণ্ডোআনাল্যাণ্ডের বিস্তার অনুমিত হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের বিপর্যয় বারে বারে হয়েছে এবং তার ফলে জল স্থল পবত উচ্চভূমি নিম্নভূমি জঙ্গল পাথর পলিমাটি প্রভৃতির উলটপালট ঘটেছে। হিমালয়ের উদ্ভব কবে হয়েছে সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নন। অনেকের মতে ৬ কোটি বৎসর পূর্বে হিমালয় টেথিস-সাগরতলে বিলীন ছিল। কেউ কেউ বলেন ৫০ হাজার বৎসর পূর্বে হিমালয় ছিল বটে, কিন্তু আর্যাবর্ত তখনও সাগরগর্ভে। হিমালয়ের পাদভূমি এখনও সুস্থিত নয়, তার লক্ষণ মাঝে মাঝে ভূমিকম্প।

হিমালয়ের উত্থানের সময় পৃথিবীতে সম্ভবত মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু মানুষ-আবির্ভাবের পরেও ভূপৃষ্ঠের বিপর্যয় অনেকবার হয়েছে। পুরাণে এবং বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে তার মূল শুধুই কল্পনা নয়। প্রাচীন যুগের

মানুষ হয়তো সমুদ্রতল থেকে ভূমির বা পর্বতের উদ্‌গম স্বচক্ষে দেখেছে। তার অস্পষ্ট স্মৃতি কিংবদন্তীতে রক্ষিত থাকা বিচিত্র নয়। পুরাণে যে মহাবরাহ-সমুত্থানের কথা আছে তার মূলেও এইরকম অতিপ্রাচীন কিংবদন্তী থাকতে পারে। খনিজপ্রসঙ্গে পুরাণকথা অবান্তর, কিন্তু বিষয়টি কৌতূহলজনক, সেজন্য বিষ্ণুপুরাণ থেকে কিছু তুলে দিচ্ছি।

জগৎ একার্ণব হ'লে নারায়ণাত্মক প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধার কামনা করলেন এবং বরাহরূপে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। তখন পৃথিবী তাঁর অনেক স্তব করলেন। তারপর—

এবং সংস্তূয়মানস্তু পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ।
সামস্বরধ্বনিঃ শ্রীমান্ জগর্জ পরিঘর্ঘরম্॥
ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচনঃ।
রসাতলাদুৎপলপত্রসন্নিভঃ
সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান্॥
উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
তৎসংপ্লবাম্ভো জনলোকসংশ্রয়ান্।
প্রক্ষালয়ামাস হি তান্ মহাদ্যুতীন্
সনন্দনাদীনপকল্মষান্ মুনীন্॥
প্রয়ান্তি তোয়ানি খুরাগ্রবিক্ষতে
রসাতলেঽধঃ কৃতশব্দসন্ততি।
শ্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রয়ান্তি
সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি॥
উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্রকুক্ষে-
র্মহাবরাহস্য মহীং বিধার্য।
বিধুন্বতো বেদময়ং শরীরং
রোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি।

পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ।—পৃথিবীকর্তৃক এইরূপে সংস্তূয়মান, সামস্বর-ধ্বনি, শ্রীমান্ ধরণীধর পরিঘর্ঘর শব্দে গর্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উৎপলপত্র-সন্নিভ প্রফুল্লপদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্তদ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন। উঠিবার সময় সেই সংপ্লববারি তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ুদ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনন্দনাদি বিগতপাপ মুনিসকলকে প্রক্ষালিত করিল। জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিক্ষত রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জনলোকে যেসকল সিদ্ধ বাস করেন তাঁহারা তাঁহার শ্বাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন। মহীকে ধারণ করিয়া উত্তিষ্ঠমান জলার্দ্রকুক্ষি কম্পিতকায় সেই মহাবরাহের রোমে আচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

পর্বত প্রদেশ থেকে নির্গত হয়ে নদী যখন নীচে নামে তখন তার স্রোতের বেগে বিশ্লিষ্ট ও ক্ষরিত পাথরের নুড়ি বালি আর মাটি সঙ্গে সঙ্গে আসে এবং ক্রমশ থিতিয়ে পড়ে, তার ফলে নদীধৌত প্রদেশ কালক্রমে উঁচু হয়। আর্যাবর্তের সমতলের উত্থান এইরকমে হয়েছে। হিমালয় নিজের গাত্র ক্ষয় ক'রে উপাদান যুগিয়েছে এবং হিমালয়দুহিতা সিন্ধু গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদী সেই উপাদান বয়ে এনে আর্যাবর্তে বিছিয়ে সমভূমি তৈরি করেছে। এই স্তরবিন্যাস নদীর সমগ্র পথে হয়েছে। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ উত্তরপূর্ব ভারতে ছটার মতন শতধারায় বিসৃত হয়ে পলিমাটি ঢেলে পূর্বসাগরের কতকটা ভরাট ক'রে উর্বরা বঙ্গভূমি সৃষ্টি করেছে।

উত্তর ভারত যখন জলময়, দক্ষিণ ভারত তখনও উচ্চভূমি। হিমালয় আর বিন্ধ্যপ্রভৃতি পর্বত একেবারে ভিন্নজাতীয়। সমুদ্রতল ভাঁজ হয়ে ঠেলে ওঠায় হিমালয় উদ্‌ভূত হয়েছে। এরকম পর্বতকে বলা হয় 'বলিত পর্বত' (fold mountain)। বিন্ধ্য প্রভৃতি অধিকাংশ দাক্ষিণাত্য পর্বত অতিপ্রাচীন পাষাণময় মালভূমির অংশ, বাত্যা বৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবে ক্ষয় পেয়ে বর্তমান আকার

পেয়েছে। এদের বলা হয় 'শিষ্ট পর্বত' (relict mountain), অর্থাৎ ক্ষয়ের পর যা অবশিষ্ট আছে। আরাবলি বলিত পর্বত, কিন্তু হিমালয়ের চেয়ে প্রাচীন। আমাদের দৃষ্টিতে বিন্ধ্য একটা মাঝারি পর্বতশ্রেণী আর হিমালয় নগাধিরাজ। মহাকালের গণনায় বিন্ধ্য বনিয়াদী বৃদ্ধ আর হিমালয় অর্বাচীন ভুঁইফোঁড়।

হিমালয় যে সাগরতল থেকে উঠেছে তার একটি প্রমাণ তার শিলাদেহের উপাদান। এই শিলা বহু স্থলে মারবেল-জাতীয় — সাগরতলে স্তরীভূত প্রাণি-কঙ্কালজাত চুনেপাথরের পরিবর্তিত রূপ। কয়েক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর শিলীভূত নিদর্শনও পাওয়া যায়। আর্যাবর্তে আগ্নেয় শিলা কম দেখা যায়, বেশীর ভাগই পাললিক বা তা থেকে রূপান্তরিত। কিন্তু দক্ষিণাপথের অধিকাংশ শিলা আগ্নেয় বা তার রূপান্তর — প্রায় ২ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান ব্যাসল্ট নামক আগ্নেয় শিলায় আচ্ছন্ন, তার বেধ বা গভীরতা দু-তিন হাজার ফুট। এই বিশাল শিলারাশি অতি পুরাকালে বার বার অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গলিত লাভা থেকে উৎপন্ন।

যে প্রদেশ শুধুই পলিমাটিতে গঠিত এবং প্রাচীন নয় সেখানে বেশীরকম খনিজ পাওয়া যায় না। এই কারণে নিম্নবঙ্গের এবং তত্তুল্য অন্য প্রদেশের খনিজসম্পদ প্রায় নগণ্য।

রাজপুতানার পশ্চিমাংশে আরাবলি পর্বত থেকে সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার বর্গ মাইল স্থান বালুকাময়, তারই মধ্যে থর (Thar) মরুভূমি। এই বিস্তৃত ভূভাগ গভীর বালির স্তরে ঢাকা, সেই বালি প্রধানত আরবসাগরের সৈকত থেকে বাতাসে উড়ে এসে ক্রমে ক্রমে জমা হয়েছে। এর দক্ষিণপশ্চিমে রান (Rann of Cutch) নামক কচ্ছপ্রদেশের লবণময় শুষ্কপ্রায় অগভীর জলাভূমি।

পঞ্জাব প্রদেশের উত্তরপশ্চিমে লবণপর্বত (Salt Range) নামে একটি অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী আছে, তার অনেক অংশ লবণময় স্তরে গঠিত। এই লবণের উৎপত্তি কোনও প্রাচীন সমুদ্রের অংশ থেকে, যা কালক্রমে শুখিয়ে গেছে এবং ঠেলে উঠেছে।

ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষত যুক্তপ্রদেশে ক্ষার এবং বিবিধ লবণময় ঊষর ভূমি আছে। এই ক্ষার-লবণকে 'রেহ' বলা হয়। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান করা হয় যে নিকটবর্তী নদীর জল ভূমিতে শোষিত হয় এবং সেই জলে দ্রবীভূত উপাদানের সঙ্গে ভূনিম্নস্থ অন্যান্য উপাদানের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ক্ষার-লবণ উৎপন্ন হয়ে শুখিয়ে মাটির উপর ফুটে ওঠে। বিহার ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে মাটি থেকে যে শোরা পাওয়া যায় তারও উৎপত্তি কতকটা এইপ্রকার, কিন্তু তার উপাদান জৈব।

৪। খনিজের অবস্থান

মানুষের প্রয়োজনীয় খনিজ যেখান থেকে তোলা হয় তারই নাম খনি বা আকর। খনি ভূমির উপরেও থাকতে পারে, অনেক নীচেও থাকতে পারে। গলিত শিলা যখন ভূগর্ভে ধীরে ধীরে শীতল হয় তখন অবস্থাবিশেষে তার কতকগুলি উপাদান দানা বেঁধে পৃথক্ হয়ে মূল শিলার মধ্যে বিশেষ বিশেষ খনিজের শিরা (vein) রূপে বিন্যস্ত হয়। উপরের এবং আশেপাশের পাথর কেটে এইরকম খনিজ উদ্ধার করতে হয়। মাইসোরে কোলার-স্বর্ণখনি স্থানে স্থানে ৫ হাজার ফুট গভীর। অনেক স্থানে ভূপৃষ্ঠের উলটপালটের ফলে বহুনিম্নস্থ খনিজ অপেক্ষাকৃত উপরে উঠে এসেছে, সেজন্য সহজেই তার নাগাল পাওয়া যায়। সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে পাহাড়ের গা থেকেই হিমাটাইট বা লোহাপাথর কেটে নেওয়া হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূল শিলারাশি প্রাকৃতিক কারণে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তখন তার অন্তর্বর্তী খনিজ বৃষ্টি বা নদীর জলে বাহিত হয়ে নিম্নভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। সোনার কণা, চুনি, মনাজাইট প্রভৃতি এই অবস্থায় কয়েক স্থানে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে যত খনিজ পাওয়া যায় তার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বিহার প্রদেশে সংগৃহীত হয়। খনিজসম্পদে বিহার অগ্রগণ্য। তারপরেই মাদ্রাজ প্রদেশ,

মাইসোর ও ত্রিবাঙ্কুরের স্থান। মধ্যপ্রদেশেও কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ রানীগঞ্জের কয়লার জন্য এবং আসাম পেট্রোলিয়মের জন্য খ্যাত। ভারতের বিশাল ভূমিতে কোথায় কি আছে তার নিঃশেষ সন্ধান এখনও হয় নি।

ভারতবর্ষে হিমাটাইট বা লোহাপাথরের ভাণ্ডার অতি বিপুল, অন্য কোনও দেশে এত নেই। অভ্র, মনাজাইট এবং ইলমেনাইট সম্বন্ধেও এদেশ শীর্ষস্থানীয়। ম্যাংগানিজ সম্বন্ধে ভারতের একমাত্র সমকক্ষ রাশিয়া। এদেশে বকসাইট যা পাওয়া যায় তা থেকে প্রচুর অ্যালিউমিনিয়ম ধাতু হতে পারে। কয়লা খুব বেশী নেই, পেট্রোলিয়ম অতি অল্প। কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব আছে, যথা গন্ধক, রাং, পারদ, নিকেল। মলিব্‌ডেনম অতি কম পাওয়া যায়। দস্তা সীসেও কম, কিন্তু আরও পাবার সম্ভাবনা আছে। তামা আছে, কিন্তু আরও দরকার। সোনার পরিমাণ অল্প নয়, কিন্তু রুপো খুব কম। সিমেণ্ট, কাচ, এবং চীনেমাটির জিনিস তৈরির উপাদান প্রচুর আছে। নুন যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে, অভাব যা দেখা যায় তা প্রকৃতির কার্পণ্যজনিত নয়।

কোন্ প্রদেশে কি কি খনিজ পাওয়া যায় তার একটি তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল, এতে শুধু প্রধান প্রধান খনিজের উল্লেখ আছে। বেলুচিস্থান ভারতের প্রাকৃতিক সীমার বাইরে হ'লেও ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত, সেজন্য তালিকায় দেওয়া হয়েছে। বর্মা ও সিংহল ভারতের বহির্ভূত, সেজন্য বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খনিজের বিবরণে প্রসঙ্গত এই দুই স্থানের কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

সোনা মৌলিক অবস্থায় অর্থাৎ ধাতুরূপেই পাওয়া যায়, তার সঙ্গে প্রায় কিছু রুপো এবং কদাচিৎ অল্প প্ল্যাটিনম মিশ্রিত থাকে। তামাও ধাতুরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু অতি বিরল। এদেশে আর সব ধাতুই অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে অর্থাৎ যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। যেসব খনিজ প্রধানত ধাতু-নিষ্কাশনের জন্যই সংগৃহীত হয়, তালিকায় এবং পরবর্তী বিবরণের শীর্ষে তাদের নাম না দিয়ে ধাতুর নামই দেওয়া হয়েছে।

আসাম।—পেট্রোলিয়ম, কয়লা, চুনেপাথর, কুরুবিন্দ, সিলিম্যানাইট।

বঙ্গ।—কয়লা, লোহা, নুন।

বিহার।—কয়লা, লোহা, তামা, ম্যাংগানিজ, অভ্র, বকসাইট, ক্রোমাইট, চুনেপাথর, কেওলিন, কোঅর্ট্‌স-বালি, স্লেট, টংস্টেন, অ্যাসবেসটস, ব্যারাইট, স্টিয়াটাইট, অ্যাপাটাইট, পাইরাইট, গ্র্যাফাইট, পিচব্লেণ্ড।

উড়িষ্যা।—লোহা, কয়লা, অ্যাসবেসটস, গ্র্যাফাইট, পাইরাইট, ব্যারাইট, সিলিম্যানাইট।

যুক্তপ্রদেশ।—বেলেপাথর, ক্ষার-লবণ, কোঅর্ট্‌স-বালি, স্লেট।

মধ্যপ্রদেশ।—ম্যাংগানিজ, বকসাইট, চুনেপাথর, মারবেল, স্টিয়াটাইট, কয়লা, ব্যারাইট, অ্যাসবেসটস, সিলিম্যানাইট, কুরুবিন্দ।

মধ্যভারত।—বকসাইট, কয়লা, কুরুবিন্দ, ব্যারাইট, অ্যাসবেসটস, সিলিম্যানাইট।

রাজপুতানা—নুন, মারবেল, ব্যারাইট, জিপসম, কয়লা, গ্র্যাফাইট, অ্যাসবেসটস, সীসে, কোবল্ট, মলিব্‌ডেনম।

পঞ্জাব।—নুন, পেট্রোলিয়ম, কয়লা, জিপসম, পাইরাট, স্লেট।

কাশ্মীর।—বকসাইট, সোহাগা, জিপসম।

উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।—জিপসম।

বেলুচিস্থান।—ক্রোমাইট, গন্ধক, কয়লা, নুন, ব্যারাইট।

বোম্বাই প্রদেশ।—নুন, বকসাইট, ম্যাংগানিজ, অ্যাসবেসটস, স্টিয়াটাইট, জিপসম।

ত্রিবাঙ্কুর।—মনাজাইট, ইলমেনাইট, জারকন, সিলিম্যানাইট, গ্র্যাফাইট, মলিব্‌ডেনম।

মাইসোর।—সোনা, রুপো, লোহা, অ্যাসবেসটস, বকসাইট, ক্রোমাইট, ম্যাংগানিজ, কুরুবিন্দ, গ্র্যাফাইট।

নিজাম রাজ্য।—কয়লা, পাইরাইট, গ্র্যাফাইট।

মাদ্রাজ প্রদেশ।—নুন, ম্যাগনিসাইট, ম্যাংগানিজ, অভ্র, অ্যাসবেসটস, ব্যারাইট, গ্র্যাফাইট, কুরুবিন্দ।

৫। জল

যতরকম খনিজ আছে তার মধ্যে জল মানুষের সবচেয়ে দরকারী, সেজন্য প্রথমেই আলোচ্য। জলের বিশাল ভাণ্ডার সমুদ্র, তা ছাড়া নদী হ্রদ প্রভৃতিও আছে। সূর্যতাপে বাষ্পীভূত হয়ে জল বায়ুতে মিশে যায়, উপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে মেঘে পরিণত হয়, আবার বৃষ্টিরূপে নীচে ফিরে আসে। জলবাষ্পের কতক অংশ হিমালয়শিখরে বরফ হয়ে জমে, এবং গ্রীষ্মে সেই বরফ গ'লে সিন্ধু গঙ্গা

যমুনা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির খাতে প্রবাহিত হয়। অনেক নদী উপনদীর উৎপত্তি শুধু বৃষ্টির জল থেকে, যেমন শোণ নর্মদা গোদাবরী কাবেরী প্রভৃতি। বৃষ্টির এবং নদীবাহিত জলের কতকটা মাটিতে শোষিত হয়, কতকটা সমুদ্রে চলে যায়।

সমুদ্রজলে শতকরা প্রায় ৩½ ভাগ নানাজাতীয় লবণ আছে, তার মধ্যে সোডিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ সাধারণ নুনই বেশী। তার চেয়ে অনেক কম আছে ম্যাগনিশিয়ম পোটাসিয়ম ও ক্যালসিয়ম যুক্ত লবণ (ক্লোরাইড, সালফেট), আরও কম ক্যালসিয়ম কার্বনেট, লেশমাত্র ব্রোমাইড আয়োডাইড, এবং লেশের চেয়েও কম ফসফেট সিলিকা তামা সোনা রুপো। সমুদ্রজল থেকে নুন তৈরি অতি প্রাচীন শিল্প। অনেক দেশে ম্যাগনিশিয়ম ক্লোরাইডও উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি আমেরিকায় ব্রোমিন বার করা হচ্ছে, কিন্তু সোনা রুপো উদ্ধারের খরচ পোষায় নি। নদী হ্রদ প্রভৃতির জলও বিশুদ্ধ নয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে পুরাকালে সমুদ্রের জলে এত লবণ ছিল না, ভূপৃষ্ঠস্থ শিলারাশির দ্রবণীয় অংশ বৃষ্টি আর নদীর জলে মিশে সমুদ্রে এসে বিবিধ লবণরূপে কোটি কোটি বৎসরে সঞ্চিত হয়েছে।

জল যখন বাষ্পাকারে ওঠে তখন তার লবণাদি নীচে পড়ে থাকে। বকযন্ত্রে পাতিত জল (distilled water) যেমন বিশুদ্ধ, বৃষ্টির জলও সেইরকম, কিন্তু পড়বার সময় বাতাসের ধুলো তার সঙ্গে মেশে। মধ্যবর্ষায় ধোয়া বাতাসে ধুলো খুব কম, সেজন্য তখনকার বৃষ্টির জল আরও নির্মল। বায়ুমণ্ডলে কিঞ্চিৎ অঙ্গারাম্ল বা কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, বৃষ্টির জলে তার কতকটা মিশে যায়। পরিমাণ কম হ'লেও ভূপৃষ্ঠস্থ বিবিধ খনিজদ্রব্যের উপর তার প্রভাব সামান্য নয়।

অনেক শিলার উপাদান ক্যালসিয়ম কার্বনেট। চুনেপাথর এবং খড়ি (চা-খড়ি) তাতেই গঠিত। এই পদার্থ জলে গলে না, কিন্তু জলে অঙ্গারাম্ল থাকলে গলে। বৃষ্টির জলে অঙ্গারাম্ল থাকায় এই জাতীয় শিলার নিরন্তর ক্ষয় হচ্ছে এবং সেই দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম কার্বনেট নদীর জলে মিশে অবশেষে সমুদ্রে যাচ্ছে। সাধারণ মাটিতেও এই পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। খড়িতে কোনও

অ্যাসিড (যেমন নেবুর রস) দিলে অঙ্গারাম্লের বুদ্‌বুদ বার হয়, মাটিতে দিলেও একটু হয়। মাটিতে যে ক্যালসিয়ম কার্বনেট থাকে তা আত্মসাৎ ক'রে বৃষ্টির জল ভূমির নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয়। মাটিতে যদি অন্য দ্রবণীয় উপাদান থাকে (সাধারণ লবণ, ম্যাগনিশিয়ম-যুক্ত লবণ, ইত্যাদি) তবে তাও সেই জলে গৃহীত হয়। এইরকম ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিশিয়ম-যুক্ত পদার্থ যে জলে বেশী তাকে বলা হয় খর জল (hard water), যাতে কম তার নাম মৃদু জল (soft water)। খর জলে সাবান ভাল গলে না, দইএর মতন গাদ পড়ায় কতক সাবান নষ্ট হয়, দাল সহজে সিদ্ধ হয় না, জল ফোটালে কেতলি প্রভৃতি পাত্রের ভিতর শক্ত স্তর জমে। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে এবং কলকাতার কাছে অনেক কুয়োর জলে এই দোষ দেখা যায়। কলকাতার খালের জলে সমুদ্রজল আসে সেজন্য তা অত্যন্ত খর আর নোনা। চলিত কথায় খর জলকে ভারী বা বোদা জল এবং মৃদু জলকে হালকা বা মিঠে জল বলা হয়। দার্জিলিংএর জল অত্যন্ত মৃদু, সেজন্য গায়ে সাবান মেখে জলে ধুলে হড়হড়ে ভাব সহজে যেতে চায় না।

খর জল ফোটালে যে গাদ পড়ে তার ফলে খরতা কতকটা ক'মে যায়। উপযুক্ত মাত্রায় চুন সোডা প্রভৃতির যোগে এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খর জলকে মৃদু করা যায়। অনেক কারখানায় বয়লার প্রভৃতির জন্য এই উপায়ে জলশোধন করা হয়। পানীয় জলের জন্যও অনেক স্থানে এই রকম ব্যবস্থা আছে।

গঙ্গা প্রভৃতি হিমালয়জাতা নদীর জল মোটের উপর মৃদু। কলকাতার কলের জলেরও খরতা কম। মোহানার কাছে নদীতে সমুদ্রের জোয়ারের জল আসায় নুন এবং খরতা বাড়ে সেজন্য কলকাতার দক্ষিণে গঙ্গার জল বিস্বাদ। কলকাতার প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে পলতা নামক স্থানে গঙ্গা থেকে শহরের জন্য জল সংগ্রহ করা হয়।

মাটির আর একটি অতি সাধারণ উপাদান লোহা। এই লোহা অক্সিজেন-সংযোগে ফেরিক বা ফেরস অক্সাইড রূপে থাকে। ফেরস অক্সাইড অঙ্গারাম্লযুক্ত

জলে দ্রব হয়, কিন্তু ফেরিক অক্সাইড (বা হাইড্রক্সাইড) হয় না। বাংলা দেশের অনেক স্থানে পাতকুয়ো বা নলকূপের জল তোলবার সময় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু হাওয়া লাগলে উপরে সর পড়ে এবং তা থিতিয়ে লালচে বা হলদে গাদ হয়ে জমে। এই পরিবর্তনের কারণ— অঙ্গারাম্ল উবে যাওয়ায় ফেরস অক্সাইড অদ্রাব্য হয় এবং বায়ুর অক্সিজেন-যোগে তা ফেরিক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। এইরকম জলে কাপড় কাচলে ক্রমশ তাতে গেরুয়া রং ধরে।

ভূমিতে যদি বালি নুড়ি কাঁকর প্রভৃতি বেশী থাকে তবে তার ভিতর দিয়ে সহজেই জল প্রবেশ করে এবং নীচে নামতে থাকে। এঁটেল মাটির স্তর এবং নিরেট পাথর অপ্রবেশ্য (impervious), তাদের ভিতরে জল যায় না। ভূমির নীচে যেখানে অপ্রবেশ্য স্তর থাকে সেইখানে জলের অধোগতি থামে এবং তার উপরে বালি প্রভৃতির প্রবেশ্য (pervious) স্তরে জল জমতে থাকে। এজন্য প্রবেশ্য স্তরের নীচ থেকে উপরে কতকটা দূর পর্যন্ত জলপূর্ণ বা সংপৃক্ত (saturated) হয়। বর্ষা শেষ হ'লে মাটি উপর থেকে শুখতে আরম্ভ করে, তার ফলে নীচে সঞ্চিত জলের উর্ধ্ব সীমা বা থাড়াই ক্রমশ নামতে থাকে, এবং অনেক স্থানে গ্রীষ্মকালে একবারে লুপ্ত হয়। এরকম স্থানের কুয়োতে গ্রীষ্মকালে জল পাওয়া যায় না। যেখানে মাটির নীচে সঞ্চিত জল একবারে শুখিয়ে যায় না সেখানেও ইঁদারা পাতকুয়ো এবং নলকূপের গভীরতা সংপৃক্ত স্তরের যথাসম্ভব তলা পর্যন্ত হওয়া উচিত, নতুবা বার মাস জল না পাওয়া যেতে পারে।

যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম এবং বালি প্রভৃতির স্তর উপর থেকে অনেক নীচে পর্যন্ত নেমে গেছে সেখানে খুব গভীর কুয়ো করতে হয়। নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানে, যেমন কলকাতার আশেপাশে, মাটির ৩।৪ হাত নীচেই জল পাওয়া যায়, এবং গ্রীষ্মকালেও তা খুব নীচে নামে না। তার কারণ — এইসব স্থানে বৃষ্টি বেশী, এবং প্রবেশ্য স্তরও খুব গভীর নয়, অনেক জায়গায় ৫০।৬০ ফুট নীচেই অপ্রবেশ্য এঁটেল মাটির স্তর। কিন্তু অপ্রবেশ্য স্তরের নীচেও আবার প্রবেশ্য স্তর পাওয়া যায় এবং

তাতেও দূরবর্তী স্থান থেকে জল এসে জমা হয়। বাংলা দেশের অনেক স্থানে এবং অন্য প্রদেশেও পর্যায়ক্রমে প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য স্তরের বিন্যাস দেখা যায়, এবং সব প্রবেশ্য স্তরের জলও সমান নয়। উপরের জল সাধারণত মৃদু, কিন্তু জীবাণু-দুষ্ট। তার নীচের জল জীবাণুশূন্য কিন্তু খর আর নোনা হতে পারে। আরও নীচের জল হয়তো নির্দোষ। নলকূপ বসাবার সময় উপযুক্ত স্তর নির্বাচন একটি কঠিন কাজ। নদীর জলের চেয়ে কুয়ো এবং নলকূপের জল সাধারণত খর।

ভারতবর্ষে অনেক স্থানে উৎস (spring) আছে, তাদের কতকগুলি থেকে গরম জল বার হয়, আবার কতকগুলির জলে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। মুঙ্গেরের কাছে সীতাকুণ্ড, পঞ্জাবে কুলু অঞ্চলে মণিকর্ণ, কাংড়ায় জ্বালামুখী, জম্মুর অন্তর্গত পুঞ্চে তাত্তাপানি, গঙ্গোত্তরী প্রদেশে, বিহারে রাজগিরে, বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরে, বোম্বাই প্রদেশে থানা জেলায়, এবং আরও নানা স্থানে উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। কতকগুলির জল এত গরম যে তীর্থযাত্রীরা তাতে ভাত সিদ্ধ করে, যেমন কুলুর মণিকর্ণ। কাংড়ায় জ্বালামুখীর জলে ব্রোমাইড ও আয়োডাইড আছে। কতকগুলির জলে গন্ধক আছে, যেমন বক্রেশ্বর, তাত্তাপানি এবং থানার প্রস্রবণ। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে দুধকুণ্ড উৎসের জল সাদা, তাতে সম্ভবত colloidal kaolin আছে। বোম্বাই প্রদেশের পাঁচমহল অঞ্চলে তুবা নামক স্থানের উৎসজল তেজস্ক্রিয় (radioactive)।

ইওরোপে spa অর্থাৎ উৎস স্থানগুলি খুব জনপ্রিয়, অসংখ্য লোকে নানা রোগের চিকিৎসার জন্য সেখানকার জল পান করে অথবা তাতে স্নান করে। অনেক উৎসস্থান শৌখিন বিলাসক্ষেত্র। কতকগুলি উৎসের জল বোতলে প্যাক হয়ে বিক্রি হয়, এদেশেও তার চালান আসে, যেমন Apenta, Vichy, Apollinaris। ভারতবর্ষে উৎসের অভাব নেই কিন্তু অধিকাংশের জলের উপাদান ও ভেষজগুণ এখনও নির্ণীত হয় নি। খুব কম লোকেই চিকিৎসার জন্য উৎসজল ব্যবহার করে। এদেশে উৎসজলের আদর তীর্থজল হিসাবে।

৬। মাটি

মাটি আর বালি দুইএরই উৎপত্তি পাথর থেকে। পাথরের অনেক উপাদান বৃষ্টির জলে ক্রমশ গ'লে যায়, তার ফলে পাথরের সংহতি নষ্ট হয় এবং কালক্রমে শক্ত পাথর গুঁড়ো হয়ে যায়। নদীর স্রোতে পাথরের নুড়ি ক্রমাগত নাড়া পেয়ে ঘর্ষণে ক্ষয় পায়। গাঁথনির ফাঁকে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি গাছ গজালে যেমন পুরনো পাকা বাড়ি ভূমিসাৎ হয়, পাহাড়ের গায়ের পাথরও সেইরকম গাছপালার শিকড়ের চাড় পেয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে ধ'সে যায়। এই সব প্রাকৃতিক কারণে কঠিন শিলা কালক্রমে চূর্ণিত হয় এবং সেই চূর্ণ গলিত উদ্‌ভিদাদির সঙ্গে মিশে মাটিতে পরিণত হয়।

মাটির প্রধান রাসায়নিক উপাদান অ্যালিউমিনিয়ম হাইড্রোসিলিকেট। তার সঙ্গে অল্পাধিক মাত্রায় অন্যান্য পদার্থও মিশ্রিত থাকে, যেমন বালি, ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনিশিয়ম কার্বনেট, ঈষৎ মাত্রায় লৌহ পোটাসিয়ম সোডিয়ম ম্যাংগানিজ গন্ধক ক্লোরিন ফসফরস নাইট্রোজেন, এবং লেশমাত্রায় তাম্র বোরন আয়োডিন ফ্লুওরিন প্রভৃতি। তা ছাড়া গলিত জৈব পদার্থও থাকে।

উৎপত্তি অনুসারে মাটি দুইপ্রকার।—(১) উচ্চতর ভূমি থেকে আগত নদীর পলি নিম্নতর ভূমিতে সঞ্চিত হওয়ায় যা উৎপন্ন হয়েছে, যেমন আর্যাবর্তের সমভূমির মাটি; (২) প্রাচীন পাষাণময় ভূমির উপরের অংশ যা বৃষ্টি প্রভৃতির প্রভাবে চূর্ণিত হয়ে মাটিতে পরিণত হয়েছে, যেমন দক্ষিণাপথের অধিকাংশ স্থানের মাটি। প্রথমপ্রকার মাটি দূর থেকে নদীকর্তৃক আনীত, দ্বিতীয়প্রকার মাটি স্থানীয় পাষাণেরই বিকার। শেষোক্ত মাটির রং সাধারণত একটু কাল বা ঘোর হয়। আর্যাবর্তের পলিমাটি উর্বরতার জন্য খ্যাত, কিন্তু অনেক স্থানে দ্বিতীয়প্রকার মাটিরও অসাধারণ উর্বরতা দেখা যায়, যেমন মধ্যপ্রদেশ গুজরাট প্রভৃতির 'কাল মাটি' (black soil) যা কাপাস চাষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। এই কাল মাটিতে ক্যালসিয়ম ম্যাগনিশিয়ম এবং লৌহের ভাগ বেশী, জৈব পদার্থও প্রচুর।

কৃষিক্ষেত্রের মাটি সাধারণত তিনরকম ধরা হয়।—(১) এঁটেল, যার কণা খুব সূক্ষ্ম এবং যাতে বালি কম; (২) বেলে, যাতে বালির ভাগ বেশী; (৩) দোআঁশ, এঁটেল আর বেলের মাঝামাঝি। এঁটেল মাটিতে সহজে জল প্রবেশ করে না, কিন্তু একবার ভিজলে শীঘ্র শুখয় না। এরকম মাটিতে গাছপালার শিকড় অনায়াসে ছড়াতে পারে না। বেলে মাটি সহজেই জল টেনে নেয় কিন্তু শীঘ্র শুখিয়ে যায়। চাষের জন্য সাধারণতঃ দোআঁশ মাটি শ্রেষ্ঠ।

কৃষিকর্ম ছাড়া নানা প্রয়োজনে মাটি মানুষের কাজে লাগে। মৃৎশিল্পে বিভিন্ন প্রকার মাটির দরকার হয়। কুমোরের চাকে হাঁড়ি ইত্যাদি গড়বার জন্য নমনীয় (plastic) মাটি চাই। এঁটেল মাটির কণা সূক্ষ্ম এবং তার কতক অংশ কলয়েড (colloid) অবস্থায় থাকে, সেজন্য এরকম মাটি খুব নমনীয়। কিন্তু একবারে বালিশূন্য এঁটেল মাটিতে কুমোরের কাজ হয় না, কারণ এরকম মাটি পোড়ালে বেশী সংকুচিত হয়, তাতে জিনিসের গড়ন বজায় থাকে না। ছাঁচে গড়বার মাটি বেশী নমনীয় না হ'লেও চলে, সেজন্য ইট টালি প্রভৃতিতে বালি কিছু বেশী দেওয়া হয়, তার ফলে পোড়াবার সময় ফাট ধরে না, সংকোচনও কমে। গঙ্গার পলিমাটি ইট তৈরির পক্ষে উত্তম, তাতে স্বভাবত উপযুক্ত পরিমাণে বালি মিশ্রিত আছে, নমনীয়তাও যথোচিত।

পোড়ালে মাটির জৈব উপাদান নষ্ট হয়, অজৈব উপাদানগুলির রাসায়নিক সংযুতি (composition) বদলে যায়, তার ফলে দৃঢ়তা আসে। মাটিতে যে লোহা থাকে তা ফেরিক অক্সাইড হয়ে যায় সেজন্য পোড়া মাটির রং লাল হয়।

সাধারণ মাটির বাসন এবং ইট প্রভৃতি বেশী তাপে পোড়ানো হয় না, কারণ তাতে মাটি গ'লে গিয়ে ঝামা হয়ে যায়। জিনিসের দৃঢ়তা ও স্থায়িতা বাড়াতে হ'লে বেশী তাপ দরকার, তার জন্য এমন মাটি চাই যা সহজে গলে না এবং পোড়ালে শক্ত হয়। সোডিয়ম পোটাসিয়ম ক্যালসিয়ম লৌহ সিলিকা প্রভৃতি যুক্ত নানাপ্রকার উপাদানের তারতম্য অনুসারে মাটির গলনীয়তা বা তাপসহতা

কমে বাড়ে। উপযুক্ত উপাদানে গড়া জিনিস বেশী তাপে পোড়ানো যায়, তার ফলে দৃঢ় ও নীরন্ধ্র হয়, অর্থাৎ সাধারণ মৃৎপাত্রের মতন তার গায়ে জল শোষিত হয় না। স্টোনওয়ার (stoneware) নামে যেসব জিনিস প্রস্তুত হয় তা এই-প্রকার। সাধারণত তার উপরে কাচের মতন চিক্কণ কঠিন লেপ (glaze) দেওয়া থাকে, যেমন জার বা বয়াম, হাত মুখ ধোবার বেসিন ইত্যাদি। স্টোনওয়ারের উপযুক্ত মাটি রানীগঞ্জ ও জব্বলপুরের কাছে পাওয়া যায়। টেরাকটা (terra-cotta) যা দিয়ে তৈরি হয় সেই মাটি অপেক্ষাকৃত গলনীয়, সেজন্য বেশী তাপে পোড়ানো হয় না এবং উপরে চিক্কণ লেপও দেওয়া হয় না। গোআলিয়রে টেরাকটার মাটি পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ সাদা মাটির নাম কেওলিন বা চীনেমাটি, যা থেকে পোর্সিলেন হয়। তার বিবরণ ৯-প্রকরণে আছে।

সাধারণ ইট প্রখর তাপে গ'লে যায়। যেখানে আগুনের আঁচ বেশী, যেমন বয়লারের চুল্লীতে, সেখানে সাধারণ ইটের গাঁথনি চলে না। বাংলা এবং বিহারের কয়লার খনির নিম্ন স্তরে, রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েক স্থানে ফায়ারক্লে (fireclay) নামে একরকম মাটির মতন বস্তু পাওয়া যায়, তা থেকে ফায়ারব্রিক (firebrick) নামক তাপসহ (refractory) ইট, ধাতু গলাবার মুচি এবং অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত হয়। ফায়ারক্লের উপাদান অ্যালিউ-মিনিয়ম সিলিকেট এবং সূক্ষ্ম বালি, তার সঙ্গে লোহ ক্যালসিয়ম ম্যাগনিশিয়ম প্রভৃতি যুক্ত পদার্থ খুব কম থাকে। রং সাধারণত ছাইএর মতন, কিন্তু পোড়ালে প্রায় সাদা হয়।

ফায়ারব্রিকও খুব প্রখর তাপ সইতে পারে না এবং কতকগুলি প্রক্রিয়ায় অন্য পদার্থের সংস্পর্শে বিকৃত হয়ে যায়। সেজন্য আরও কয়েক রকম তাপসহ ইট বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুত হয়। তাদের কথা পরে যথাস্থানে বলা হবে।

অনেক স্থানে, যেমন বর্ধমান অঞ্চলে, মাটির রং লাল। এর কারণ লৌহযুক্ত ফেরিক অক্সাইড। যে মাটিতে এই উপাদান খুব বেশী থাকে তার নাম গেরি-

৩৫/৬

মাটি (red ochre)। এলামাটি (yellow ochre, হিন্দী—রামরজ)ও এই জাতীয়, কিন্তু তাতে ফেরিক অক্সাইডের বদলে হাইড্রক্সাইড থাকে সেজন্য রং হলদে। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাইসোর, পঞ্জাব, এবং কাশ্মীরে এই দুই রঙিন মাটি প্রচুর পাওয়া যায় এবং ভারতের সর্বত্র রংএর কাজে চলে, এককালে বিলাতেও চালান যেত। Sienna এবং umber রংও এই জাতীয়, ম্যাংগানিজ থাকায় অল্পাধিক ব্রাউন। এই দুই মাটিও এদেশে পাওয়া যায় কিন্তু ব্যবহার বেশী নেই।

৭। সিলিকা, কোঅর্ট্‌স, বালি

সিলিকা (silica) বা সিলিকন ডাইঅক্সাইড নানাজাতীয় খনিজের উপাদান। ভূত্বকের সমস্ত শিলারাশির উপাদানের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সিলিকা। সিলিকার মোটামুটি তিনরকম রূপ।—(১) কেলাসিত, যেমন কোঅর্ট্‌স বা স্ফটিক, বালি ইত্যাদি; (২) যার কেলাস প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ বিশেষ যন্ত্র ভিন্ন অগোচর (cryptocrystalline), যেমন অ্যাগেট ও কষ্টি-পাথর; (৩) অকেলাসিত বা অনিবন্ধী (amorphous)। প্রথম দুই প্রকার সিলিকা জলে দ্রব হয় না, কিন্তু তৃতীয়টি অবস্থাবিশেষে দ্রবণীয় এবং বেলেপাথর প্রভৃতি নানারকম শিলার সংহতির কারণ। ওপাল মণি (opal) অকেলাসিত সিলিকায় গঠিত। অনেক উদ্‌ভিদ ও প্রাণীর দেহে এইরূপ সিলিকা থাকে, যেমন তৃণাদিতে, ডায়াটম (diatom) নামক সূক্ষ্ম জলজ উদ্‌ভিদে; স্পঞ্জে, এবং রেডিওলেরিয়া (radiolaria) নামক সূক্ষ্ম জলজ প্রাণীতে। বাঁশের ভিতর যে বংশলোচন পাওয়া যায় তাও এইরকম। চকমকি পাথর (flint)ও সম্ভবত জৈব সিলিকা থেকে উৎপন্ন।

কোঅর্ট্‌স (quartz) এর উপাদান কেলাসিত সিলিকা। স্বচ্ছ কোঅর্ট্‌সের সংস্কৃত নাম স্ফটিক, হিন্দী বিল্লৌর — যা থেকে বাংলা 'বেলোয়ারী' হয়েছে। উপরত্নরূপে গণ্য স্ফটিকের বিবরণ ২১-প্রকরণে দেওয়া হয়েছে। অনেক শিলার

উপাদান কোঅর্ট্‌স। এইরকম শিলা বৃষ্টি বা নদীর জলে বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণিত হ'লে **বালি**র উৎপত্তি হয়।

বালি এবং ছোট বড় নুড়ির আকারে কোঅর্ট্‌স ভারতে অপরিমিত। পার্বত প্রদেশে যে নানা আকারের গোলালো পাথর (pebbles) দেখা যায় তার অধিকাংশ কোঅর্ট্‌সে গঠিত। কোঅর্ট্‌সাইট (quartzite) নামক একরকম সাদা দানাদার পাথর এদেশে অনেক পার্বত অঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়, যেমন সাঁওতাল পরগনায়, মানভূম সিংহভূম জেলায়, দিল্লির রিজ (ridge) নামক পাহাড়ে। বালি বা বেলে-পাথর রূপান্তরিত হয়ে এর উৎপত্তি। অনেক স্থানে এই পাথর দিয়ে রাস্তা করা হয়। চকমকির জন্যও এর ব্যবহার আছে।

বালির প্রধান ব্যবহার চুন বা সিমেণ্টের সঙ্গে মিশিয়ে পলস্তারা কংক্রিট ইত্যাদি করবার জন্য। তীক্ষ্ণ বা খোঁচা খোঁচা বালি এই কাজের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। এরকম বালি গঙ্গা দামোদর প্রভৃতির ধারে পাওয়া যায়। কলকাতার কলের জল বালির ভিতর দিয়ে চালিয়ে পরিস্রুত করা হয়। বালির সঙ্গে অল্প চুন মিশিয়ে জমিয়ে স্টীমে তপ্ত করলে একরকম ইট হয় — sand-lime brick। এই ইট তৈরির একটি কারখানা হাওড়ায় ছিল, কিন্তু লাভ না হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে।

কাচের অন্যতম উপাদান বালি। সাধারণ বালির সঙ্গে নানারকম অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে, যেমন অভ্র, চুনেপাথর, ফেরিক অক্সাইড, মাটি। এরকম বালিতে ভাল কাচ হয় না। যার উপাদান শুধুই কোঅর্ট্‌স এবং যার দানা বর্ণহীন ও প্রায় সমান, এমন বালিই কাচ তৈরির পক্ষে শ্রেষ্ঠ। ভাগলপুর জেলায় কলগাঁর নিকটবর্তী পাথরঘাটায়, বর্ধমান জেলায় আসানসোলে, হাজারিবাগ জেলায় গিরিডি অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশে নাইনির কাছে, এবং জব্বলপুর, বিকানির, বরোদা ও মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েক স্থানে কাচের উপযুক্ত বিশুদ্ধ সাদা বালি (quartz sand) পাওয়া যায়। পোর্সিলেনের উপাদানরূপে এবং শৌখিন পলস্তারার কাজেও এই বালি চলে। চূর্ণ কোঅর্ট্‌সাইট থেকেও কাচ হয়। নিকৃষ্ট কাচের জন্য খুব বিশুদ্ধ বালি দরকার হয় না।

রানীগঞ্জ প্রভৃতির কয়লার খনিতে ফায়ারক্লে ছাড়া আর একরকম মাটির মতন পদার্থ পাওয়া যায় — গ্যানিস্টার (gannister)। এর প্রধান উপাদান সিলিকা বা অতি সূক্ষ্ম বালি। গ্যানিস্টার থেকে সিলিকা ব্রিক তৈরি হয়। এই ইট ফায়ারব্রিকের চেয়ে তাপসহ এবং অম্লধর্মী পদার্থের সংস্পর্শে বিকৃত হয় না।

৮। ব্যাসল্ট, গ্র্যানিট, বেলেপাথর, মারবেল, ল্যাটিরাইট, স্লেট

ব্যাসল্ট বা ট্র্যাপ (basalt, trap) আগ্নেয় শিলা, এর উৎপত্তি ভূগর্ভনিঃসৃত গলিত লাভা থেকে। শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাওয়ায় এই শিলার কেলাস বা দানা বড় হ'তে পারে নি। ব্যাসল্টের রং প্রায় কাল, বেশী পোড়া ঝামার মতন; প্রধান উপাদান প্লেজিওক্লেজ-ফেল্ড্স্পার (plagioclase feldspar, পোটাসিয়ম-সোডিয়ম-ক্যালসিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম সিলিকেট) এবং পাইরক্সিন (pyroxene, ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিশিয়ম-লৌহ-ম্যাংগানিজ মেটাসিলিকেট)। এই পাথর খুব দৃঢ়, সহজে ভাঙে না, সেজন্য রাস্তা পাকা করবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

রাজমহল পাহাড়ে, বোম্বাইপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে, নিজাম রাজ্যে, মধ্য-প্রদেশে এবং মধ্যভারতে এই পাথর প্রচুর পাওয়া যায়। দক্ষিণাপথের একটি বিশাল অংশ এই শিলায় গঠিত তা ৩-প্রকরণে বলা হয়েছে। কলকাতার রাস্তা যে ব্যাসল্ট দিয়ে বাঁধানো হয় তা পাকুড় (সাঁওতাল পরগনা) থেকে আসে। রাস্তার উপর ট্রাম-লাইন দৃঢ়বদ্ধ করবার জন্য এই পাথর ইটের আকারে কেটে বসানো হয়। সাঁড়া বা হার্ডিঞ্জ ব্রিজ তৈরি করতে রাশি রাশি এই পাথর লেগেছে। এদেশে সিমেন্ট-কংক্রিট কাজে সাধারণত ব্যাসল্টের কুচি দেওয়া হয়। ব্যাসল্ট ইচ্ছামত আকারে কাটা শ্রমসাধ্য, রংও ভাল নয়, সেজন্য অতি মজবুত পাথর হ'লেও প্রাসাদাদি নির্মাণে বেশী চলে না।

গ্র্যানিট (granite)ও আগ্নেয় শিলা। ভূগর্ভে প্রবল চাপে তরল অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এর উৎপত্তি, সেজন্য দানা সুস্পষ্ট — grain বা

দানার জন্যই granite নাম। প্রধান উপাদান কোঅর্ট্‌স, ফেল্ড্‌স্পার এবং অভ্র। এই পাথর দৃঢ়, কিন্তু ইচ্ছামত আকারে কাটা সুসাধ্য, ধূসর গোলাপী লাল কাল প্রভৃতি নানা বর্ণের পাওয়া যায়, সেজন্য প্রাসাদ মন্দিরাদি নির্মাণের উপযোগী। মাদ্রাজ প্রদেশে উত্তর আরকটে ও অন্যত্র, এবং মাইসোরে উত্তম গ্র্যানিট পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য মন্দির এবং আনুষঙ্গিক মূর্তি প্রভৃতি এই পাথরে নির্মিত, যেমন ইলোরা, মাদুরা, চিদাম্বরম, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানে।

নাইস (gneiss) নামক একরকম রূপান্তরিত শিলা এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, তারও উপাদান গ্র্যানিটের তুল্য। অনেক স্থানে এই পাথর গ্র্যানিট নামে চলে।

বেলেপাথর (sandstone) পাললিক শিলা। এর প্রধান উপাদান বালি। জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম কার্বনেট, সিলিকা, অথবা লৌহযুক্ত পদার্থের সঙ্গে মিশে বালির স্তর জমাট হয়ে বেলেপাথরে পরিণত হয়েছে। লোহা বেশী থাকলে পাথরের রং পাটল বা লাল হয়। আগ্রায় আকবরের কেল্লা এইরকম লাল পাথরে তৈরি। বেলেপাথর সহজে কাটা যায়, এবং ব্যাসল্ট বা গ্র্যানিটের মতন দৃঢ় ও চিরস্থায়ী না হ'লেও ইমারতের কাজে সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। বিন্ধ্য-গিরিশ্রেণীর নিকটবর্তী স্থানে — গয়া জেলা থেকে হোশঙ্গাবাদ (মধ্যপ্রদেশ), সেখান থেকে গোআলিয়র রাজ্য এবং আগ্রা — এই বিস্তৃত ভূভাগে সর্বোৎকৃষ্ট বেলেপাথর পাওয়া যায়। সারনাথ ও অন্যান্য বহু স্থানের অশোকস্তম্ভ, সারনাথ সাঁচি ভারহুত প্রভৃতির বৌদ্ধ স্তূপ, আগ্রার কেল্লা, আগ্রা ও দিল্লির জুম্মা মসজিদ ও বহু প্রাসাদ, এবং গোআলিয়র অম্বর ও যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানের প্রাসাদ মন্দিরাদি বিন্ধ্যজাত বেলেপাথরে নির্মিত। নূতন দিল্লির সভাভবন এবং লাটের প্রাসাদও এই পাথরের। উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে চান্দায়, এবং গুজরাটে শোনগির অঞ্চলেও বেলেপাথর পাওয়া যায়। পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির উড়িষ্যার বেলেপাথরে নির্মিত। কলকাতায় চুনার পাথর নামে যা পাওয়া যায় তা মির্জাপুর

জেলার বেলেপাথর। প্রাচীন মূর্তির অধিকাংশ বেলেপাথরে গড়া। জাঁতা আর শিল-নোড়াও এই পাথরে তৈরি হয়।

মারবেল (marble, ফারসী—মর্মর) রূপান্তরিত শিলা, চাপ ও তাপের প্রভাবে চুনেপাথর থেকে উৎপন্ন। বিশুদ্ধ মারবেলের রং সাদা, উপাদান কেলাসিত ক্যালসিয়ম কার্বনেট। অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকলে নানারকম রং দাগ বা নকশা হয়। সাদার চেয়ে কাল বা রঙিন বা বিচিত্র সুদৃশ্য মারবেলের দাম বেশী। মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর, বিটুল, ছিন্দোআরা, নাগপুর, সিওনি প্রভৃতি স্থানে মারবেল আছে। রাজপুতানায় যোধপুর, কিষনগড়, জশলমির, আজমির, জয়পুর, আলোআর প্রভৃতি স্থানে সাদা ও রঙিন উৎকৃষ্ট মারবেল পাওয়া যায়। আগ্রার তাজমহল ও কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল যোধপুরের মেকরানা অঞ্চলের বিখ্যাত মারবেলে নির্মিত। কাল মারবেলকে অনেকে কষ্টি-পাথর বলে, কিন্তু প্রকৃত কষ্টি সিলিকা-জাত। পূর্ববর্ণিত পাথরগুলির তুলনায় মারবেলের দৃঢ়তা ও স্থায়িতা কম। সূক্ষ্ম দানাযুক্ত মারবেল মূর্তিনির্মাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। মোটা দানার মারবেল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী, সেজন্য প্রাসাদাদি নির্মাণের উপযোগী।

ভারতবর্ষে মারবেলের অভাব নেই, তথাপি প্রাসাদাদির মেঝের জন্য ইটালি-জাত পাথরই এযাবৎ বেশী চ'লে আসছে। তার কারণ, দেশী মারবেল সংগ্রহ ও সরবরাহের ভাল ব্যবস্থা নেই।

দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে, উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে এবং আরও কয়েক অঞ্চলে **ল্যাটিরাইট** (laterite) নামে একরকম পাথর পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে, অনেকে মনে করেন জল আর বাতাসের প্রভাবে ব্যাসল্ট বিকৃত হয়ে ল্যাটিরাইটে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান উপাদান অ্যালিউমিনিয়ম ও লোহ হাইড্রক্সাইড, তা ছাড়া অল্পাধিক পরিমাণে ম্যাংগানিজ, টাইটেনিয়ম ও সিলিকা থাকে। ১২-প্রকরণে বর্ণিত বকসাইটের সঙ্গে এর

নিকট সম্বন্ধ আছে। ল্যাটিরাইটের রং পাটল বা সুরকির মতন, দেখতে ফোঁপরা। খনি থেকে তোলবার সময় নরম থাকে, কিন্তু হাওয়া লাগলে কালক্রমে শক্ত হয়। ভাঙা ল্যাটিরাইট চাপ পেলে ক্রমশ জুড়ে যায়। উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে এই পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়। সদ্য খনি থেকে তোলা ল্যাটিরাইট দিয়ে গাঁথনি করবার সময় চুন সুরকির দরকার হয় না। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অনেক স্টেশন ল্যাটিরাইট-নির্মিত।

স্লেট (slate) রূপান্তরিত শিলা, এর উৎপত্তি কর্দমজাত শেল (shale) নামক পাললিক শিলা থেকে। এদেশে শক্ত শেলও স্লেট নামে চলে। স্লেটের রং কাল বা ধূসর। এই পাথরের প্রধান গুণ — চাড় দিয়ে অনায়াসে স্তরে স্তরে ভাগ করতে পারা যায়। স্লেট কঠিন পাথর নয়, সহজেই আঁচড় পড়ে। পঞ্জাবে কাংড়া ও রেওয়ারি অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশে গাঢ়োআল ও আলমোড়া জেলায়, এবং মুঙ্গেরের কাছে খরকপুর পাহাড়ে স্লেট পাওয়া যায়। অনেক স্থানে ছাদ ছাইবার এবং মেঝের উপরে দেবার জন্য স্লেট চলে। লেখবার জন্য কাংড়া আর মুঙ্গেরের স্লেটের চলন এককালে খুব ছিল, তার পর বিদেশ থেকেই বেশী আসত। এখন আমদানি বন্ধ হওয়ায় দেশী স্লেটের আবার আদর হয়েছে। লোহার চাদরের নকল স্লেটও কিছু চলে। নরম স্লেটে স্লেট-পেনসিল হয়। বড় ইলেকট্রিক সুইচবোর্ড স্লেট বা মারবেলে তৈরি হয়।

৯। ফেল্ড্স্পার, কেওলিন, স্টিয়াটাইট

রাসায়নিক উপাদানভেদে **ফেল্ড্স্পার** (feldspar) অনেক রকম হয়। অ্যালিউমিনিয়ম সিলিকেটের সঙ্গে সোডিয়ম পোটাসিয়ম ক্যালসিয়ম প্রভৃতির সংযোগে বিভিন্ন ফেল্ড্স্পার গঠিত। এই পাথর মারবেলের চেয়ে কঠোর, কিন্তু সহজেই ভাঙে। এতে কোনও বস্তু গড়া হয় না। স্বচ্ছ, অনচ্ছ, সাদা, রঙিন, ময়লা, নানারকম পাওয়া যায়। সিংহলে যে চন্দ্রকান্ত মণি (moonstone)

পাওয়া যায় তা স্বচ্ছ বর্ণহীন ফেল্ড্‌স্পার। সাধারণ সাদা বা অল্প ময়লা ফেল্ড্‌স্পারের প্রধান প্রয়োগ পোর্সিলেন প্রভৃতির উপাদানরূপে। এই পাথর বেশী তাপে গ'লে কাচের মতন হয়, সেজন্য পোর্সিলেনের উপরে চিক্কণ লেপ দেবার জন্য এর চূর্ণ অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে লাগানো হয়। যে কেওলিন-পিণ্ডে জিনিস গড়া হয় তাতেও ফেল্ড্‌স্পার থাকে। বর্ধমান জেলায় আসানসোল এবং হাজারিবাগ জেলায় গিরিডি অঞ্চলে এই পাথর পাওয়া যায়।

কেওলিন (kaolin) বা চীনেমাটির উৎপত্তি ফেল্ড্‌স্পার থেকে। জল এবং বাতাসের প্রভাবে ফেল্ড্‌স্পার বিশ্লিষ্ট হয়ে কেওলিন উৎপন্ন করে। বিশুদ্ধ কেওলিন সাদা, খড়ির মতন নরম। প্রধান উপাদান অ্যালিউমিনিয়ম হাইড্রো-সিলিকেট, তার সঙ্গে অল্লাধিক বালি ও অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তার ফলে কেওলিনের রং, কণার সূক্ষ্মতা, জলমিশ্রণের পর নমনীয়তা, পোড়াবার পর কঠিনতা প্রভৃতি ধর্মের ইতরবিশেষ হয়। সাধারণ মাটি কেওলিনেরই সজাতি, কেবল অন্যান্য পদার্থের মিশ্রণের জন্য রূপ গুণ বদলে গেছে।

ভাগলপুর জেলায় রাজমহল পাহাড়ের নিকট পাথরঘাটা ও মঙ্গলহাটে, সিংহভূম জেলায়, জব্বলপুরে এবং গোআলিয়রে কেওলিন পাওয়া যায়, তা থেকে কয়েকটি কারখানায় নানা জিনিস তৈরি হয়। কলকাতার পটারির পোর্সিলেন রাজমহল কেওলিনে প্রস্তুত হয়। অল্লাধিক অবিশুদ্ধ কেওলিন নানা স্থানে পাওয়া যায় এবং তাও মৃৎশিল্পে চলে। কেওলিনের অন্যান্য প্রয়োগও আছে, যেমন সুতো আর কাগজের মাড়ের উপাদানরূপে, সস্তা কাপড় কাচা সাবানে ভেজাল হিসাবে, সাদা জুতোয় লেপ দেবার জন্য, ঔষধে, ইত্যাদি। তিলকমাটিও একরকম কেওলিন।

স্টিয়াটাইট বা ট্যাল্ক (steatite, talc) নরম পাথর, নখ দিয়ে আঁচড় কাটা যায়। এর উপাদান ম্যাগনিশিয়ম সিলিকেট। বিহারে মানভূম সিংহভূম ও গয়া জেলায়, উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ ও কটকে, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরে, রাজপুতানায় জয়পুর মিবার ও আজমিরে, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে এই পাথর

পাওয়া যায়। উত্তম স্টিয়াটাইটের রং প্রায় সাদা বা অল্প ধূসর বা পাটল, স্পর্শ সাবানের মতন মসৃণ, সেজন্য এর এক নাম soapstone। এর সূক্ষ্ম চূর্ণ ট্যাল্ক পাউডার নামে বহু শিল্পে লাগে, যেমন কাগজ, বস্ত্র, রবার প্রভৃতিতে। অধিকাংশ গায়ে মাখবার পাউডারের উপাদান এই চূর্ণ, সাবানের সঙ্গেও এর ভেজাল চলে। একটু ময়লা ট্যাল্ক-চূর্ণের নাম ফ্রেঞ্চ চক। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট স্টিয়াটাইট কেটে থালা বাটি মূর্তি প্রভৃতি গড়া হয়। গয়া এবং কটকের পাথরের বাসন প্রধানত এই পাথরে গড়া। ক্লোরাইট (chlorite), সার্পেণ্টাইন (serpentine), প্রভৃতি খনিজ মিশ্রিত স্টিয়াটাইট থেকেও বাসন ও মূর্তি গড়া হয়। এইরকম পাথর শক্ত, রং স্লেটের মত কাল বা ধূসর।

এককালে এদেশে সাদা স্টিয়াটাইট খড়ি (সংস্কৃত—খটী, খটিকা, কঠিনী) নামে চলত, এখনও তার হিন্দী নাম সিলখড়ী। আজকাল খড়ি বললে সাধারণত চা-খড়ি বা chalk বোঝায়।

১০। চুনেপাথর, ম্যাগনিসাইট, জিপসম, ব্যারাইট

চুনেপাথর (limestone) পাললিক শিলা। এর প্রধান উপাদান ক্যালসিয়ম কার্বনেট, কোনও কোনও পাথরে তার সঙ্গে ম্যাগনিসিয়ম কার্বনেটও থাকে। এক শ্রেণীর চুনেপাথর জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়েছে। আর এক শ্রেণীর উৎপত্তি জৈব। সমুদ্রজলে যে অল্পমাত্রায় ক্যালসিয়ম-যুক্ত পদার্থ আছে তা অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সামুদ্রিক জীবের দেহে উপাদান-রূপে গৃহীত হয়। মাছ, ঝিনুক, শাঁখ, প্রবাল, ফরামিনিফেরা (foraminifera) প্রভৃতির কঙ্কালে বা খোলে প্রচুর ক্যালসিয়ম কার্বনেট থাকে। এই সব জীবের মৃতদেহ নিরন্তর সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে চুনেপাথররূপে স্তরীভূত হয়। পুরাকালীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই স্তর সমুদ্রতল থেকে ঠেলে উঠে ভূপৃষ্ঠে স্থানে স্থানে চুনোপাথরের পাহাড় সৃষ্টি করেছে। হিমালয়ের অনেক স্থানে এইরকম জৈব চুনেপাথর দেখা যায়।

চুনেপাথরের সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে অন্য উপাদানও মিশ্রিত থাকে, যেমন ম্যাগনিশিয়ম কার্বনেট, সিলিকা, অ্যালিউমিনিয়ম ও লোহ যুক্ত পদার্থ, ইত্যাদি। খড়ি (চা-খড়ি)ও একরকম চুনেপাথর, প্রায় বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ম কার্বনেট। এদেশে খড়ি পাওয়া যায় না, যুদ্ধের পূর্বে ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, চীন প্রভৃতি দেশ থেকে আসত, এখন ইরাক থেকে আসে। ইংরেজী chalk থেকে চা-খড়ি নাম হয়েছে (৯-প্রকরণে স্টিয়াটাইট দ্রষ্টব্য)।

সাধারণ চুনেপাথর নানা রংএর হয়, সাদা, ধূসর, কাল, ব্রাউন, ইত্যাদি। এদেশের অনেক প্রাচীন মন্দির চুনেপাথরে নির্মিত। পূর্তকর্মে এই পাথর এখনও কিছু কিছু চলে। বোম্বাই এবং করাচিতে পোরবন্দরের চুনেপাথর গৃহনির্মাণে লাগে।

চুনেপাথরের প্রধান ব্যবহার চুন ও সিমেণ্ট তৈরির জন্য। এই পাথর পুড়িয়ে যে চুন হয় তাই পাথুরে চুন। চুন তৈরির উপযুক্ত পাথর এদেশের নানা স্থানে পাওয়া যায়, যেমন আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে — যা থেকে সিলেট চুন হয়, মধ্যপ্রদেশে কাটনি ও সুতনায়, বিহারে রোটাসগড় ডেহরি ও কল্যাণপুরে, এবং উড়িষ্যায় গাংপুরে। যে পাথরে ক্যালসিয়ম কার্বনেট ছাড়া অন্য পদার্থ বেশী নেই তার চুনের আঁট আর নমনীয়তা বেশী, পলস্তারার কাজে তাই (fat lime) শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। সিলেট চুন এই রকম। পাথরে যদি পরিমিত মাত্রায় অ্যালিউ-মিনিয়ম সিলিকেট প্রভৃতি মৃৎপদার্থ (clay) থাকে তবে তার চুন ভিজে অবস্থাতেও কতকটা সিমেণ্টের মতন জ'মে যায়। এরকম চুন (hydraulic lime) আর্দ্র স্থানে ভিত গাঁথবার পক্ষে ভাল। বিহার ও মধ্যপ্রদেশের পাথুরে চুন এই রকম। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে প্রাচীন নদীখাতে কঙ্কর বা ঘুটিং নামে এক রকম ডেলা ডেলা পাথর পাওয়া যায়, তারও উপাদান ক্যালসিয়ম কার্বনেট এবং অল্পাধিক মৃৎপদার্থ। এই কঙ্কর থেকে ঘুটিং চুন হয়।

চুনেপাথর বা কঙ্করের গুঁড়োর সঙ্গে উপযুক্ত মাত্রায় মৃৎপদার্থ মিশিয়ে পোড়ালে সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। সিমেণ্টের রাসায়নিক উপাদান ক্যালসিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম-

সিলিকা-ঘটিত কতকগুলি যৌগিক পদার্থ। জলসংযোগে এই সব উপাদানের সংযুতি পরিবর্তিত হয়, তার ফলে সিমেণ্ট শক্ত হয়ে যায়। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, গুজরাট প্রভৃতি নানাস্থানে সিমেণ্টের কারখানা হয়েছে।

ম্যাগনিসাইট (magnesite) দেখতে খড়ির মতন, কিন্তু আরও শক্ত। এর উপাদান ম্যাগনিশিয়ম কার্বনেট। মাদ্রাজপ্রদেশে সালেম এবং শেবারয় অঞ্চলের পাহাড়ে প্রচুর পাওয়া যায়। মাইসোর, কইম্বাটুর এবং ত্রিচিনাপলিতেও এর আকর আছে। এই খনিজ থেকে ম্যাগনিশিয়ম সালফেট ও ক্লোরাইড প্রস্তুত হয়, তার প্রধান প্রয়োগ বস্ত্রশিল্পে। সালফেট ঔষধরূপেও চলে। আজকাল বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রজল থেকে ক্লোরাইড তৈরি হচ্ছে। ম্যাগনিসাইট পোড়ালে ম্যাগনিশিয়া বা ম্যাগনিশিয়ম অক্সাইড হয়। ম্যাগনিশিয়ার নানারকম প্রয়োগ আছে। ঢালা-লোহা থেকে ইস্পাত বা নরম লোহা করবার জন্য একরকম চুল্লীর ভিতর ম্যাগনিশিয়া-নির্মিত ইট দেওয়া হয়। এই ইট খুব উত্তাপ সইতে পারে। ম্যাগনিশিয়া ও অ্যাসবেসটস-চূর্ণ জলের অঙ্গে মিশিয়ে কাদার মতন ক'রে বয়লার স্টীমপাইপ প্রভৃতির উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতে তাপের অপচয় কমে। ম্যাগনিশিয়া-চূর্ণের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে ম্যাগনিশিয়ম ক্লোরাইড, কাঠের গুঁড়ো বা বালি, এবং জল মিশিয়ে পলস্তারার মতন বিছিয়ে দিলে প্রায় সিমেণ্টের মতন শক্ত হয়ে যায়। এই পদার্থের নাম সরেল (Sorrel) বা অক্সিক্লোরাইড সিমেণ্ট, এদেশে রেলগাড়ির কামরার মেঝে করতে প্রচুর ব্যবহার হয়।

ইওরোপ আমেরিকা ও জাপানে ম্যাগনিসাইট থেকে ম্যাগনিশিয়ম ধাতু তৈরি হয়। এদেশে তার চেষ্টা হয় নি। ম্যাগনিশিয়ম জ্বাললে তীব্র আলোক হয়, ফোটোগ্রাফির ফ্ল্যাশ-ল্যাম্পে তার প্রয়োগ আছে। এই ধাতু অ্যালিউমিনিয়মের সঙ্গে মিশিয়ে এয়ারোপ্লেনের অঙ্গনির্মাণে ব্যবহার করা হয়। বর্তমান যুদ্ধে ম্যাগনিশিয়ম-নির্মিত বোমা আগুন লাগাবার জন্য এয়ারোপ্লেন থেকে ফেলা হচ্ছে।

জিপসম (gypsum)এর উপাদান ক্যালসিয়ম সালফেট এবং তার সঙ্গে

সংযুক্ত একটু জল। বিশুদ্ধ জিপসমের রং সাদা, কিন্তু সাধারণত যা পাওয়া যায় তা অল্পাধিক ধূসর বা ব্রাউন। এই খনিজ এদেশে অনেক স্থানে প্রচুর পাওয়া যায়, যেমন পঞ্জাবে লবণপর্বতের পাদদেশে, কাংড়া ও ঝিলম জেলায়, উত্তরপশ্চিম সীমান্তে কোহাট অঞ্চলে, কাশ্মীরে, রাজপুতানায়,যোধপুর বিকানির প্রভৃতি স্থানে, সিন্ধু প্রদেশে, এবং কাথিয়াবাড়ে। যুক্তপ্রদেশেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। জিপসমের গুঁড়ো পরিমিত তাপে গরম ক'রে তার জলের কিয়দংশ দূর করলে প্লাস্টার অভ প্যারিস (plaster of Paris) তৈরি হয়। এই গুঁড়োতে জল মিশিয়ে যদি ক্ষীরের মতন করা হয় তবে অল্প সময়ে জ'মে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়। নানা বস্তুর ছাঁচ ও প্রতিমূর্তি গড়বার জন্য এবং নকশার কাজে এই প্ল্যাস্টার লাগে, সিমেণ্টের সঙ্গেও একটু মেশানো থাকে। এদেশে অনেক তৈরি হচ্ছে।

অ্যালাবাস্টার (alabaster, হিন্দী—রুখম) নামে একরকম ঈষদচ্ছ (translucent) সাদা জিপসম আছে, তা দিয়ে নানা শৌখিন বস্তু গড়া হয়। ভাল অ্যালাবাস্টার এদেশে পাওয়া যায় না, ইটালি থেকে আসে। আগ্রায় তা দিয়ে তাজমহলের প্রতিকৃতি, নকশা কাটা কৌটো, বাতিদান, ল্যাম্পশেড প্রভৃতি তৈরি হয়।

ব্যারাইট (barite, barytes) দেখতে কতকটা সাদা মারবেলের মতন, কিন্তু ঈষদচ্ছ এবং আরও ভারী। এর উপাদান বেরিয়ম সালফেট। মাদ্রাজে করনুল ও সালেম জেলায়, রাজপুতানায় আলোআর ও আজমিরে, বেলুচিস্থানে, মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরে, মধ্যভারতে, বিহারে রাঁচি অঞ্চলে, এবং উড়িষ্যায় গাংপুরে পাওয়া যায়। ব্যারাইটের সূক্ষ্ম চূর্ণ রং তৈরি করতে লাগে। রং হিসাবে এর আবরণশক্তি (covering power) কম, অর্থাৎ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে বিশেষ সাদা দেখায় না। কিন্তু কাঠ লোহা ইত্যাদির উপর এর সূক্ষ্ম চূর্ণের যে স্তর বা লেপ পড়ে তা ক্ষয় নিবারণ করে, সেজন্য অন্য রঙ্গক দ্রব্য (pigment) কম দিলেও চলে। এদেশে ব্যারাইট শুধু রং তৈরি করতেই লাগে, কিন্তু ইওরোপ আমেরিকায় তা থেকে বিবিধ বেরিয়ম-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থও প্রস্তুত হয়।

১১। অভ্র, অ্যাসবেসটস, সিলিম্যানাইট, কায়ানাইট, গ্র্যাফাইট, গারনেট, কুরুবিন্দ

অভ্র (mica) উপাদানভেদে অনেকপ্রকার হয়। যা সব চেয়ে সাধারণ, সর্বোৎকৃষ্ট এবং এদেশে প্রচুর পাওয়া যায় তার বিশেষ নাম মস্কোভাইট (muscovite)। এর উপাদান অ্যালিউমিনিয়ম-পোটাসিয়ম অর্থোসিলিকেট, তার সঙ্গে একটু জল সংযুক্ত থাকে। খনি থেকে অভ্র চাপড়ার আকারে তোলা হয়, তা থেকে অভ্রের পাত তবকে তবকে খুলে ফেলা যায়। অন্যান্য বহু খনিজের সঙ্গে অভ্রের কুচি মিশ্রিত থাকে। যে অভ্র বর্ণহীন স্বচ্ছ, যাতে ফাট বা দাগ নেই, এবং যা থেকে বড় বড় পাত পাওয়া যায়, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ। অভ্র স্থিতিস্থাপক, তড়িতের অপরিবাহী — অর্থাৎ এর ভিতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ যেতে পারে না, তাপসহ, তাপের বিকিরণও রোধ করতে পারে, কিন্তু প্রখর তাপে বিকৃত হয়।

উৎকৃষ্ট অভ্র ভারতে যত আছে আর কোনও দেশে তত নেই। ইং ১৯৩৮ সালে এদেশে সংগৃহীত অভ্রের মোট মূল্য ৪২ লক্ষ টাকা। পৃথিবীতে যত অভ্র ব্যবহার হয় তার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এদেশের। অভ্রের প্রধান ভাণ্ডার বিহার প্রদেশ, মুঙ্গের হাজারিবাগ ও গয়া জেলাতেই বেশী পাওয়া যায়। মাদ্রাজ প্রদেশে নেল্লোর জেলায় এবং রাজপুতানায় আজমির-মারোআড়ার খনি থেকেও অভ্র তোলা হয়। নেল্লোরের খনিতে লম্বা-চওড়ায় ৯ ফুট পর্যন্ত নিখুঁত অভ্রের পাত পাওয়া গেছে। ভারতীয় অভ্রের অধিকাংশই বিদেশে চালান যায়।

অভ্রের চাপড়া থেকে পাত খোলায় খুব নিপুণতা দরকার। এদেশে আদিম জাতীয় স্ত্রীলোক এবং ছেলেরাই এই কাজ করে। তাদের নিপুণতার খ্যাতি এমন যে বিদেশ থেকেও কিছু কিছু অভ্রের চাপড়া এদেশে পাত খোলাবার জন্য আসে।

এদেশে বহুকাল থেকে কাচের বদলে অভ্র চ'লে আসছে। সেকালে শোভাযাত্রার আলোর জন্য যে খাসগেলাসের চলন ছিল তা অভ্র দিয়ে তৈরি হ'ত।

প্রতিমার সাজ এবং নানারকম অলংকরণেও অভ্র লাগে। বিবিধ কর্মের জন্য যেসব চুল্লী (furnace, oven)র চলন আছে তার ভিতরে দেখবার জন্য অভ্রের জানালা বসানো হয়। পলতেওয়ালা কেরোসিন-স্টোভে এইরকম জানালা থাকে। অভ্রের ছাঁট গুঁড়ো ক'রে কাদা বা ম্যাগনিশিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে বয়লার ইত্যাদির উপর প্রলেপ দেওয়া হয়, তাতে তাপ রক্ষিত হয়। সূক্ষ্ম অভ্রচূর্ণ রংএর কাজেও চলে। অভ্রের প্রধান প্রয়োগ — মোটর ডাইনামো প্রভৃতি বিবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অঙ্গবিশেষে বিদ্যুৎপরিবহণ রোধ করবার জন্য। অভ্রের ছোট টুকরো গালা প্রভৃতি দিয়ে জুড়ে মাইকানাইট (micanite) নামক বস্তু প্রস্তুত হয়, তার চাদর ব্লক নল প্রভৃতিও বৈদ্যুতিক যন্ত্রনির্মাণে লাগে। এদেশে মাইকানাইট তৈরি হচ্ছে।

দুই বিভিন্নজাতীয় খনিজের সাধারণ নাম **অ্যাসবেসটস** (asbestos)। প্রথম জাতির বিশেষ নাম সারপেণ্টাইন (serpentine, একপ্রকার ম্যাগনিশিয়ম সিলিকেট)। দ্বিতীয় জাতির বিশেষ নাম অ্যাম্ফিবোল (amphibole, ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিসিয়ম মেটাসিলিকেট)। এই দুই খনিজই অবস্থাবিশেষে অ্যাসবেসটসের রূপ পায়। প্রথমজাতীয় অ্যাসবেসটসই শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়, মাদ্রাজ প্রদেশে কডাপা জেলায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জাতি বিহারে সিংহভূম জেলায় সরাইকেলায় ও মুঙ্গের জেলায়, বোম্বাই প্রদেশে ইদর রাজ্যে, এবং মাইসোরে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, মাদ্রাজ প্রদেশ এবং রাজপুতানাতেও কিছু আছে। এই দুইজাতীয় অ্যাসবেসটসেই অল্পাধিক অ্যালিউমিনিয়ম সোডিয়ম পোটাসিয়ম এবং লৌহ যুক্ত পদার্থ থাকে।

খনি থেকে অ্যাসবেসটস চাপড়ার আকারে পাওয়া যায়, দেখতে কতকটা পাটের গোড়ার মতন জমাট অংশুর গুচ্ছ। রং সাদা সবুজ বা ব্রাউন, প্রায় শণ বা রেশমের মতন চকচকে। অংশুগুলি ছিঁড়ে পৃথক্ করা যায়। অংশু যত লম্বা অভঙ্গুর এবং নমনীয় হয় ততই দাম বেশী হয়। ভাল অ্যাসবেসটসের অংশু প্রায়

তুলোর মতন নরম, তা দিয়ে দড়ি করা হয়, কাপড় বোনা হয়, এবং জমিয়ে ব্লটিং কাগজের তুল্য বোর্ড তৈরি হয়। এইসব জিনিস অদাহ্য, সেজন্য তপ্ত যন্ত্রাদিতে এবং অগ্নিরোধক বস্ত্র পর্দা প্রভৃতি তৈরি করতে লাগে। এখন পর্যন্ত বিদেশ থেকেই এইসব জিনিস আসে। অ্যাসবেসটস তাপসহ এবং সাধারণ অ্যাসিড প্রভৃতির সংস্পর্শে সহজে নষ্ট হয় না। অনেক যন্ত্রে তাপের বিকিরণ রোধ করবার জন্য অ্যাসবেসটসের বোর্ড বা পলস্তারার আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সিমেণ্টের সঙ্গে অ্যাসবেসটস-চূর্ণ মিশিয়ে যে শ্লেটের মতন সমতল অথবা ঢেউতোলা চাদর তৈরি হয় তা গৃহনির্মাণে গ্যালভানাইজ্‌ড চাদরের বদলে খুব চলছে। এই চাদর বেশী তাতে না, মরচে প'ড়ে নষ্টও হয় না। এদেশে বোম্বাই এর কাছে তৈরি হচ্ছে। অ্যাসবেসটসের সঙ্গে নরম পিচ বা অ্যাসফাল্ট মিশিয়ে একরকম পলস্তারা তৈরি হয়, তা ছাদের ফাট মেরামতের জন্য চলে।

সিলিম্যানাইট (sillimanite) একরকম অ্যালিউমিনিয়ম সিলিকেট। আসামে খাসিয়া পাহাড়ে, উড়িষ্যায় বামড়া রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশ ভাণ্ডারায়, মধ্য-ভারতে রেওআ রাজ্যে, এবং ত্রিবাঙ্কুরে পাওয়া যায়। রং ধূসর, ব্রাউন বা সবুজ-ব্রাউন, খনিতে চাপ-বাঁধা সূক্ষ্ম দানার আকারে থাকে। সিলিম্যানাইট খুব কঠোর, এর চূর্ণ শানের জন্য কিছু কিছু চলে। এই খনিজের প্রধান গুণ তাপসহত্ব, প্রখর তাপেও গলে না। সিলিম্যানাইট জমিয়ে একরকম ইট হয়, কাচ গলাবার কুণ্ডের জন্য তা বিশেষ উপযোগী। এদেশে এই ইট অল্প তৈরি হয়, টাটার লোহ-কারখানায় তার চলন আছে।

কায়ানাইট (kyanite) এর উপাদান সিলিম্যানাইটের তুল্য, ব্যবহারও একই উদ্দেশ্যে হয়। বিহারে খারসাবান রাজ্যে প্রচুর পাওয়া যায়, তা ছাড়া সিংহভূম ও মানভূম জেলায়, রাজপুতানায় কিষনগড় ও আজমির-মারোআড়ায়, মাদ্রাজ প্রদেশে নেল্লোর ও কইম্বাটুর জেলায়, মাইসোরে, এবং নিজাম রাজ্যে কিছু আছে।

কার্বন বা অঙ্গারক তিনরূপে দেখা যায়—(১) কয়লা ভূকসোলি প্রভৃতি,

(২) গ্র্যাফাইট, (৩) হীরক। প্রথম রূপ অকেলাসিত, আর দুটি কেলাসিত। এই তিন পদার্থের উপাদান এক হ'লেও লক্ষণ একেবারে বিভিন্ন।

গ্র্যাফাইট (graphite ,black lead, plumbago) কয়েকপ্রকার শিলার খাঁজে চাপড়া অথবা পাতলা স্তরের আকারে পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি অজৈব উপাদান থেকে আগ্নেয় শিলা রূপে, অথবা প্রখর তাপে কয়লা প্রভৃতি জৈব উপাদানের রূপান্তরের ফলে হয়েছে। এদেশে দ্বিতীয়প্রকার গ্র্যাফাইট বিরল।

সিংহলে যে গ্র্যাফাইট পাওয়া যায় তা সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বত্র তার আদর আছে। ভারতেও কয়েক স্থানে পাওয়া যায়, যেমন উড়িষ্যায় কালাহাণ্ডি ও পাটনা রাজ্যে, রাজপুতানায় আজমির-মারোআড়ায়, মাদ্রাজ প্রদেশে ভিজিগাপটমে, ত্রিবাঙ্কুরে, মাইসোরে, নিজাম রাজ্যে এবং বিহারে পালামউ অঞ্চলে।

গ্র্যাফাইট তাপ ও তড়িতের পরিবাহী, অত্যন্ত তাপসহ, উপাদান কার্বন হ'লেও সহজে দগ্ধ হয় না। স্পর্শ মসৃণ, রং চিক্কণ ধূসর-কৃষ্ণ, অনেকটা সীসের তুল্য, সেজন্য এক নাম black lead। শক্ত নয়, নখ দিয়ে আঁচড় কাটা যায়, কাগজে ঘষলে দাগ পড়ে। গ্র্যাফাইট-নির্মিত মুচি ধাতু গলাবার জন্য চলে। লোহা ঢালাইএর জন্য যে বালির ছাঁচ গড়া হয় তার ভিতর মসৃণ করবার জন্য গ্র্যাফাইট-চূর্ণ মাখানো হয়। অনেক যন্ত্রে ঘর্ষণ কমাবার জন্য গ্র্যাফাইট লাগানো হয়। পেনসিলের সীসের উপাদান গ্র্যাফাইট ও চীনেমাটি, উপযুক্ত তাপে পুড়িয়ে দরকার মত শক্ত বা নরম করা হয়। রংএর উপাদানরূপে এবং স্টোভ ইত্যাদির গা চকচকে করবার জন্য গ্র্যাফাইটের ব্যবহার আছে।

আমেরিকায় বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উৎকৃষ্ট কৃত্রিম গ্র্যাফাইট তৈরি হচ্ছে। এই পদার্থের প্রতিযোগে কালক্রমে হয়তো স্বাভাবিক গ্র্যাফাইটের ব্যবহার উঠে যাবে।

গারনেট (garnet) নানাপ্রকার, এদেশে যা পাওয়া যায় তা প্রধানত অ্যালামাণ্ডাইট (alamandite) জাতীয়, উপাদান লোহ-অ্যালিউমিনিয়ম সিলিকেট। গারনেট অতি কঠোর পাথর, বেগনী, লাল, ব্রাউন বা কাল রংএর দানা বা ডেলার

আকারে পাওয়া যায়। সুদৃশ্য গারনেট রত্নরূপে গণ্য, তার কথা ২১-প্রকরণে বলা হয়েছে। সাধারণ গারনেট মাদ্রাজ প্রদেশের তিনেভেল্লি জেলায়, ত্রিবাঙ্কুরে মনাজাইট ইত্যাদির সঙ্গে, বিহার প্রদেশে হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলায়, রাজপুতানায় জয়পুর কিষনগড় মিবার আজমির প্রভৃতি অঞ্চলে, যুক্তপ্রদেশে ঝাঁসি গাঢ়োআল ও আলমোড়ায়, এবং বেলুচিস্থানে পাওয়া যায়। এদেশে গারনেটের বিশেষ প্রয়োগ নেই, বিদেশেই চালান যায়। গারনেট-চূর্ণ থেকে সিরিশ কাগজের তুল্য শান দেবার কাগজ ও কাপড় তৈরি হয়, তা চামড়া কাঠ প্রভৃতি মসৃণ করবার জন্য লাগে, কিন্তু ব্যবহার ক'মে আসছে।

কুরুবিন্দ বা কুরুন্দ পাথর (corundum) চুনি ও নীলার সজাতি, কিন্তু স্বচ্ছ নয়, অত্যন্ত কঠোর, রং সাধারণত আরক্ত ধূসর। এর উপাদান অ্যালিউমিনা বা অ্যালিউমিনিয়ম অক্সাইড। এই পাথর অন্যান্য পাথরের সঙ্গে ডেলা বা দানার আকারে পাওয়া যায়। আসামে খাসিয়া পাহাড়ে, মাদ্রাজ প্রদেশে কইম্বাটুর অনন্তপুর দক্ষিণ কানাড়া ও সালেম জেলায়, মাইসোরে, এবং মধ্যভারতে রেওআ রাজ্যে পাওয়া যায়। এদেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে অস্ত্রাদি শান দেবার এবং রত্ন পালিশ করবার জন্য কুরুবিন্দচূর্ণের প্রয়োগ আছে। এমারি (emery) ও কুরুবিন্দজাতীয়, কিন্তু লোহ অক্সাইড মিশ্রিত থাকায় কঠোরতা কম। এদেশ থেকে প্রচুর কুরুবিন্দ ইওরোপে চালান যায়। ভারতীয় নাম থেকেই ইংরেজী নাম হয়েছে। বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উৎপন্ন কৃত্রিম কুরুবিন্দ বা অ্যালণ্ডম (alundum) এবং ততোধিক কঠোর কার্বোরণ্ডম (carborundum, সিলিকন কার্বাইড)এর চলন হওয়ায় স্বাভাবিক কুরুবিন্দের ব্যবহার ক'মে আসছে।

১২। বকসাইট, ক্রোমাইট, অ্যাপাটাইট

বকসাইট (bauxite) পূর্ববর্ণিত ল্যাটিরাইটের সজাতি, এর প্রধান উপাদান অ্যালিউমিনিয়ম হাইড্রক্সাইড, তা ছাড়া লোহ ম্যাংগানিজ টাইটেনিয়ম সিলিকা

প্রভৃতিও কিছু কিছু আসে। বকসাইটে লৌহের পরিমাণ ল্যাটিরাইটের চেয়ে অনেক কম, সেজন্য রং প্রায় সাদা। অ্যালিউমিনিয়ম যত বেশী এবং লৌহ যত কম থাকে বকসাইট ততই ভাল গণ্য হয়। মধ্যপ্রদেশে বালাঘাট জেলায়, কাটনির কাছে, সরগুজা ও যশপুর রাজ্যে, মাণ্ডলা সিওনি ও নন্দগাঁও জেলায়, বিহারে পালামউ ও রাঁচি অঞ্চলে, উড়িষ্যায় কালাহাণ্ডি রাজ্যে, মধ্যভারতে রেওআ ও ভূপাল রাজ্যে, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা কয়রা ও বেলগাঁও জেলায়, মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরায় ও নীলগিরি পর্বতে, মাইসোরে, এবং কাশ্মীরে বকসাইট পাওয়া যায়।

এদেশে বকসাইট থেকে অ্যালিউমিনিয়ম সালফেট তৈরি হয়, তা প্রধানত জল পরিষ্কার করতে লাগে। ফটকিরিও বকসাইট থেকে হয়, তা দিয়ে সুতো প্রভৃতির রং পাকা করা হয়। বকসাইট নির্মিত ইট খুব তাপসহ, সেজন্য কোনও কোনও চুল্লীর ভিতর দেওয়া হয়।

ইওরোপ ও আমেরিকায় বকসাইটের প্রধান প্রয়োগ অ্যালিউমিনিয়ম ধাতু নিষ্কাশনের জন্য। ভূপৃষ্ঠে যত মাটি আর পাথর আছে তার উপাদানে এই ধাতু প্রচুর আছে— শতকরা ৭ ভাগের উপর। কিন্তু বকসাইটই একমাত্র খনিজ যা থেকে ধাতুনিষ্কাশনের খরচ পোষায়। সম্প্রতি এদেশে ত্রিবাঙ্কুরে ও রাঁচির কাছে মুরিতে অ্যালিউমিনিয়ম তৈরির কারখানা হয়েছে। বকসাইট থেকে প্রথমে অ্যালিউমিনা বা অ্যালিউমিনিয়ম অক্সাইড প্রস্তুত হয়, তার পর সেই অ্যালিউমিনা ক্রায়োলাইট (cryolite, সোডিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম ফ্লুওরাইড) নামক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তপ্ত গলিত অবস্থায় তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করা হয়, তার ফলে অ্যালিউমিনিয়ম উৎপন্ন হয়। ক্রায়োলাইট এদেশে পাওয়া যায় না, গ্রীনল্যাণ্ড থেকে আসে।

ক্রোমাইট (chromite) এর প্রধান উপাদান ক্রোমিয়ম-লৌহ অক্সাইড। এই খনিজ খুব ভারী, কঠিন, রং সাধারণত ধূসর-কৃষ্ণ পাথরের মতন জমাট আকার। বিহারে সিংহভূম জেলায়, মাইসোরে এবং বেলুচিস্থানে পাওয়া যায়। বোম্বাই প্রদেশে রত্নগিরি জেলায়, মাদ্রাজ প্রদেশ সালেম জেলায়, পাঞ্জাবে কাংড়ায়

কাশ্মীরে, এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও কিছু আছে। বেশীর ভাগ ক্রোমাইট বিদেশে চালান যায়, কিন্তু সম্প্রতি এদেশে এই খনিজ থেকে কিছু কিছু সোডিয়ম বাইক্রোমেট তৈরি হচ্ছে। এই পদার্থ প্রধানত ক্রোম-চামড়া করতে এবং সুতো প্রভৃতি রং করতে লাগে। ক্রোমাইট খুব তাপসহ, সেজন্য এর ইট চুল্লীনির্মাণে কিছু কিছু চলে।

ইওরোপ আমেরিকায় ক্রোমাইটের প্রধান প্রয়োগ ক্রোমিয়ম ধাতু নিষ্কাশনের জন্য। এই ধাতু তাড়িত চুল্লীতে লোহার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় ফেরো-ক্রোম নামক সংকরধাতু (ferro-chrome alloy) রূপে নিষ্কাশিত হয় এবং তার সঙ্গে আরও লোহা মিশিয়ে ক্রোম-স্টীল নামক ইস্পাত প্রস্তুত হয়।

অ্যাপাটাইট (apatite) এর প্রধান উপাদান ক্যালসিয়ম ফসফেট, তার সঙ্গে অল্পাধিক ক্যালসিয়ম ফ্লুওরাইড ও লৌহ অক্সাইড মিশ্রিত থাকে। খনি থেকে সাধারণত ব্রাউন, ফিকে সবুজ বা ধূসর বর্ণের ডেলা বা গুটির আকারে পাওয়া যায়। বিহারে সিংহভূম ও হাজারিবাগ জেলায়, মাদ্রাজ প্রদেশে নেল্লোর ত্রিচিনাপলি ও ভিজিগাপটম জেলায়, এবং রাজপুতানায় আজমির অঞ্চলে এর আকর আছে। অ্যাপাটাইটে ফসফরস আছে, সে জন্য এর চূর্ণ জমির সার রূপে ব্যবহার করা হয়। এই চূর্ণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে সুপারফসফেট (superphosphate) নামে যে সার প্রস্তুত হয় তার ক্রিয়া আরও দ্রুত।

১৩। ইলমেনাইট, মনাজাইট, জারকন, পিচব্লেণ্ড

ইলমেনাইট (ilmenite) এর প্রধান উপাদান টাইটেনিয়ম অক্সাইড, তার সঙ্গে লৌহ অক্সাইডও মিশ্রিত থাকে। এই খনিজ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কুমারিকা অন্তরীপের কাছে সমুদ্রতীরে কাল বালির আকারে প্রচুর পাওয়া যায়, তা ছাড়া বিহার প্রদেশে মানভূম ও সিংহভূম জেলায়, যুক্তপ্রদেশে মির্জাপুরের কাছে, মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিচিনাপলি জেলায়, পাতিয়ালা ও কাশ্মীরে, রাজপুতানায় আলোআর ও কিষনগড়ে কিছু কিছু আছে। এদেশে যা সংগৃহীত হয় সবই বিদেশে চালান যায়।

ইলমেনাইট থেকে টাইটেনিয়ম অক্সাইড প্রস্তুত হয়। বকসাইটেও এই পদার্থ কিছু আছে। সাদা রং করবার শ্রেষ্ঠ উপাদান টাইটেনিয়ম অক্সাইড, এর আবরণ-শক্তি সফেদা (হোআইট লেড) এবং জিঙ্ক অক্সাইডের চেয়ে অনেক বেশী। টাইটেনিয়ম-ঘটিত কতকগুলি যৌগিক পদার্থ সুতো প্রভৃতির রং পাকা করতে লাগে। ক্রোমিয়মের তুল্য টাইটেনিয়ম ধাতুও লোহার সঙ্গে মিলিত অবস্থায় নিষ্কাশিত হয় এবং তা থেকে একজাতীয় ইস্পাত তৈরি হয়।

মনাজাইট (monazite) এর উপাদান সিরিয়ম থোরিয়ম ল্যান্থানম ডিডিমিয়ম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধাতুর ফসফেট, তার সঙ্গে ইলমেনাইটও মিশ্রিত থাকে। এই খনিজও ত্রিবাঙ্কুরে সমুদ্রতীরে বালির আকারে ইলমেনাইটের সঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। বিহার প্রদেশে গয়া জেলায় ও ধলভূমে, বোম্বাই প্রদেশে ইদর রাজ্যে, মাইসোরে, এবং উড়িষ্যায় চিল্কা হ্রদের কাছেও কিছু আছে। ত্রিবাঙ্কুরে যত মনাজাইট আছে পৃথিবীতে আর কোথাও তত নেই। সমস্তই বিদেশে চালান যায়।

মনাজাইটে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ থোরিয়ম অক্সাইড বা থোরিয়া পাওয়া যায়, প্রধানত সেজন্যই তার আদর। থোরিয়া থেকে থোরিয়ম নাইট্রেট হয়, গ্যাসের আলোর ম্যাণ্টেলের তা প্রধান উপকরণ। ম্যাণ্টেল সুতো দিয়ে বোনা হয়, তার পর থোরিয়ম নাইট্রেট আর অল্প সিরিয়ম নাইট্রেটের দ্রবে ভিজিয়ে শুখনো হয়। ম্যাণ্টেল জ্বাললে সুতো ছাই হয়ে যায়, শুধু থোরিয়ম আর সিরিয়ম অক্সাইডের কঙ্কাল থাকে, উত্তপ্ত হ'লে তা থেকে প্রখর আলো বার হয়। আজকাল এদেশে বিস্তর ম্যাণ্টেল তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তার উপকরণ পুরনো ম্যাণ্টেলের ভস্ম অথবা বিদেশ থেকে আনা থোরিয়ম সিরিয়ম নাইট্রেট।

মনাজাইটের অন্যতম উপাদান সিরিয়ম ধাতুর সঙ্গে লোহা এবং অল্প পরিমাণে অন্য কয়েকটি ধাতু মিশিয়ে সের-আয়রন (cer-iron) নামক সংকরধাতু তৈরি হয়। এই ধাতু উকোর মতন কোনও জিনিস দিয়ে একটু ঘষলেই স্ফুলিঙ্গ বার হয়। সিগারেট ধরাবার lighterএ তারই টুকরো থাকে।

মনাজাইট গরম করলে তার আয়তনের প্রায় সমপরিমাণ হিলিয়ম গ্যাস পাওয়া যায়।

জারকন (zircon) এর উপাদান জারকোনিয়ম সিলিকেট। স্বচ্ছ ও সুদৃশ্য জারকনের নাম গোমেদ, সিংহলে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে যা আছে তা রত্ন নয়, তথাপি মূল্যবান্। ত্রিবাঙ্কুরের বালিতে ইলমেনাইট ও মনাজাইটের সঙ্গে জারকন পাওয়া যায় এবং তার সমস্তই ইওরোপে চালান যায়। এই খনিজ থেকে জারকোনিয়ন অক্সাইড বা জারকোনিয়া প্রস্তুত হয়। জারকোনিয়া প্রচণ্ড তাপেও গলে না, সেজন্য কোনও কোনও চুল্লীতে লাগানো হয়। ধাতুর উপরে লাগাবার ইনামেলের উপকরণ রূপেও এর প্রয়োগ আছে।

পিচব্লেণ্ড (pitchblende) গয়া জেলায় সিংগার অঞ্চলের অভ্রখনিতে পুঞ্জীভূত কাল গুটির আকারে পাওয়া যায়। এতে ইউরেনিয়ম এবং অন্য কয়েকটি ধাতুর অক্সাইড আছে। পিচব্লেণ্ডে অতি অল্প মাত্রায় রেডিয়ম থাকে, প্রধানত সেই জন্যই তার আদর। রেডিয়ম তৈরি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ সেজন্য তার দামও অত্যধিক। তেজস্ক্রিয়তার জন্য রেডিয়ম ক্যানসার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। এদেশের পিচব্লেণ্ড বিলাতে চালান যায়।

১৪। গন্ধক, পাইরাইট

ভারতবর্ষে **গন্ধক** (sulphur) এর অত্যন্ত অভাব। এদেশে যা দরকার হয় তার সমস্তই পূর্বে সিসিলি জাভা আর জাপান থেকে আসত, এখন যুদ্ধের জন্য অতি কষ্টে মাঝে মাঝে আমেরিকা থেকে আসছে। এর অধিকাংশ সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করতে লাগে। গন্ধক জ্বাললে যে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায় তা দিয়ে চিনির কারখানায় আকের রস নির্মল করা হয়। কিছু গন্ধক চা-বাগান প্রভৃতিতে গাছের পোকা মারবার জন্য এবং আতশবাজি তৈরি করতে লাগে। গন্ধক সহজেই জ্বলে, সেজন্য এককালে দেশলাইএর কাঠিতে লাগানো হ'ত।

বেলুচিস্থানে কিলাট অঞ্চলে সন্নি নামক স্থানে গন্ধক পাওয়া যায়। এর সঙ্গে প্রচুর জিপসম ও সিলিকা মিশ্রিত আছে, গন্ধকের ভাগ শতকরা ২৫ থেকে ৫০। এই অশোধিত গন্ধক থেকে এখন এদেশে অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে। বেলুচিস্থানে কোহ্-ই-সুলতান নামক প্রাচীন আগ্নেয়গিরির কাছেও এইরকম গন্ধক পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে ব্যারেন আইল্যাণ্ড নামক দ্বীপেও কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহের চেষ্টা হয় নি।

গন্ধকের একটি সংস্কৃত নাম শুল্বারি (শুল্ব-অরি) অর্থাৎ তাম্রের শত্রু। গন্ধক-সংস্পর্শে তামা কাল হয়ে যায় সেইজন্য এই নাম। কোনও কোনও ভাষাবিজ্ঞানী অনুমান করেন এথেকেই ল্যাটিন নাম sulfur হয়েছে। ভারতে গন্ধক বিরল, ইটালিতে প্রচুর, তথাপি সেদেশে সংস্কৃত নাম কেন গেল তা আশ্চর্যের বিষয়। হয়তো প্রাচীন কালেও সিসিলির গন্ধক এদেশে আসত এবং ল্যাটিন নামই সংস্কৃত রূপ পেয়েছে।

পাইরাইট (pyrite, iron pyrites) এর উপাদান লৌহ সালফাইড, তার সঙ্গে অনেক স্থলে কিছু আরসেনিক থাকে। এই খনিজ নানাজাতীয় শিলার সঙ্গে কেলাসিত দানা বা ডেলার আকারে পাওয়া যায়। পাইরাইট খুব শক্ত, ভারী, ধাতুর তুল্য উজ্জ্বল, রং পিতলের মতন, সংস্কৃত নাম স্বর্ণমাক্ষিক। অজ্ঞ লোকে পাইরাইটের চকচকে দানা দেখে সোনা মনে করে, সেজন্য এর উপনাম fool's gold। বিগত বিহার ভূমিকম্পে স্থানে স্থানে মাটি ফেটে গিয়ে পাইরাইটের দানা বার হয়, অনেকে সোনা ভেবে তা সযত্নে সংগ্রহ করেছিল।

বিহারে সিংহভূম ও ধলভূম অঞ্চলে, উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জে, আসামে ও পঞ্জাবে কয়লার খনিতে, পাতিয়ালা রাজ্যে, সিমলা পাহাড়ে, নিজাম রাজ্যে, এবং মাইসোরে পাইরাইট পাওয়া যায়। সম্ভবত আরও অনেক স্থানে আছে, কিন্তু সংগ্রহের চেষ্টা হয় নি। উত্তম পাইরাইটে শতকরা ৫০ ভাগ গন্ধক থাকে। ইওরোপে সালফিউরিক অ্যাসিড করবার জন্য গন্ধকের বদলে অনেক স্থলে পাইরাইট চলে।

১৫। নুন, সোহাগা, ক্ষার-লবণ, শোরা

আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে 'লবণ' শব্দ প্রসারিত অর্থে চলে, ক্ষারধর্মী ও অম্লধর্মী উপাদানের সংযোগে উৎপন্ন পদার্থমাত্রই লবণ। অর্থবিভ্রাট পরিহার করবার জন্য খাদ্যলবণ অর্থে **নুন** লেখা হ'ল।

নুনের উপাদান সোডিয়ম ক্লোরাইড। উৎপত্তিভেদে নুনের সঙ্গে অল্প অন্য পদার্থও মিশ্রিত থাকে। এদেশে যতরকম নুন উৎপন্ন হয় তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় — (১) সামুদ্রিক, যা সমুদ্রের জল শুখিয়ে তৈরি হয়, (২) ভৌম, অর্থাৎ লবণাক্ত ভূমি অথবা হ্রদাদি থেকে যে নুন উদ্ধৃত হয়, (৩) আকরিক, যা পাথরের মতন জমাট আকারে খনি থেকে পাওয়া যায়।

সমুদ্রজলে শতকরা প্রায় ৩·৫ ভাগ নানাজাতীয় লবণ দ্রবীভূত আছে— একথা ৫-প্রকরণে বলা হয়েছে। শুধু নুন বা সোডিয়ম ক্লোরাইডের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২·৭২ ভাগ। এদেশে যে সামুদ্রিক নুন তৈরি হয় তার সাধারণ নাম 'করকচ'। বোম্বাই প্রদেশে— বিশেষত কচ্ছ অঞ্চলে, মাদ্রাজের কাছে, এবং উড়িষ্যার উপকূলে এই নুন উৎপন্ন হয়। সমুদ্রতীরে যে অঞ্চলে বর্ষা কম এবং রৌদ্র প্রচুর সেখানেই অল্প খরচে নুন করা সম্ভবপর। জোয়ারের জল যতদূর ওঠে তার কিছু উপরে কতকগুলি চৌবাচ্চা এঁটেল মাটি দিয়ে গড়া হয়, জোয়ারের সময় তাতে সমুদ্রজল ডোঙা দিয়ে তুলে ভরা হয়। মাদ্রাজে অনেক স্থলে জোয়ারের জল সরাসরি চৌবাচ্চায় আসতে দেওয়া হয়, ভ'রে গেলে মাটির বাঁধ দিয়ে অতিরিক্ত জল আসা বন্ধ করা হয়। রৌদ্রের তাপে জল শুখিয়ে গেলে তাতে নুনের দানা বাঁধে, তখন ঝুড়ি ক'রে তা তুলে নেওয়া হয়। কয়েক বৎসর থেকে মেদিনীপুর জেলাতেও এইরকমে নুন করা হচ্ছে, কিন্তু এই অঞ্চলে বর্ষা বেশী সেজন্য রৌদ্রের অভাবে অনেক সময় নুনের রস কড়ায় জাল দিয়ে শুখতে হয়। করকচ নুনে ঈষৎ মাটি থাকে সেজন্য খুব সাদা নয়। কিছু ম্যাগনিশিয়ম ক্লোরাইডও থাকে সেজন্য বর্ষাকালে র'সে যায়। ভারতবর্ষে যে নুন উৎপন্ন হয়

তার শতকরা ৮০ ভাগের উপর করকচ। লিভারপুল ও এডেন থেকে যে নুন আসত তাও সামুদ্রিক।

ভৌম নুনের প্রধান উৎপত্তিস্থান রাজপুতানার সাম্ভর হ্রদ। ভূবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে কচ্ছ প্রদেশের রান্ নামক স্থান এবং আরবসাগরের তীর থেকে গ্রীষ্মকালীন দক্ষিণপশ্চিম বায়ুতে রাশি রাশি নুনের কণা উড়ে এসে রাজপুতানার ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষাকালে সেই নুন বৃষ্টির জলে গ'লে সাম্ভর হ্রদে আসে, তারপর গ্রীষ্মকালে শুখিয়ে দানা বাঁধে। এই নুনের প্রাচীন নাম শাকম্ভরী লবণ। রাজপুতানায় এবং অন্যত্র আরও কয়েক স্থানে অল্প পরিমাণে মাটি থেকে নুন উদ্ধার করা হয়।

আকরিক নুন (rock-salt)এর প্রধান ভাণ্ডার পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিমবর্তী লবণপর্বতমালা — যার কথা ৩-প্রকরণে বলা হয়েছে। এই নুন ঝিলম জেলায় খিউরা নামক স্থানে Mayo minesএ, কোহাট জেলায় বাহাদুরখেল অঞ্চলে, এবং মণ্ডি রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের আকরিক নুন পাথরের মতন, প্রায় বিশুদ্ধ, অল্প লৌহ অক্সাইড থাকায় ঈষৎ লাল আভা দেখা যায়। এদেশে সৈন্ধব নুন নামে যা চলে তা এই বস্তু। হামবুর্গ (জার্মনি) থেকে যে নুন আসত তাও আকরিক। সে নুনও সৈন্ধব নামে চলত।

সোহাগা (borax)র উপাদান সোডিয়ম টেট্রাবোরেট (বা বাইবোরেট), তার সঙ্গে কিছু জল সংযুক্ত থাকে। সংস্কৃত নাম — সৌভাগ্য, টঙ্কন। কাশ্মীরের উত্তরস্থ লাদখ অঞ্চলে পুগা উপত্যকায় কয়েকটি উৎসের জল থেকে সোহাগা পাওয়া যায়। নিকটবর্তী তিব্বতের কতকগুলি হ্রদের জল থেকেও সোহাগা উৎপন্ন হয়। এককালে এদেশে শুধু এই সোহাগারই চলন ছিল এবং তা টিংকল (tincal) নামে ইওরোপে বিস্তর চালান যেত। এখন আমেরিকার কালিফোর্নিয়া প্রদেশ থেকে প্রচুর সোহাগা আমদানি হয়, তার ফলে দেশী সোহাগার চলন ক'মে গেছে।

সোহাগা নানা কাজে লাগে, যেমন কাচ- বস্ত্র- ও মৃৎ-শিল্পে, ঔষধরূপে এবং সোনা রুপো পিতল কাঁসা ঝালবার জন্য।

পূর্বে ৩-প্রকরণে বলা হয়েছে যে ভারতের কয়েক স্থানে ক্ষারলবণময় উষর ভূমি আছে। যুক্তপ্রদেশে কানপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী কয়েকটি স্থানে, পঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং মাদ্রাজ প্রদেশে এইরকম ভূমি দেখা যায়। এই **ক্ষার-লবণ** গ্রীষ্মকালে মাটির উপরে ফুটে ওঠে। এর নাম 'রেহ', প্রধান উপাদান সোডিয়ম কার্বনেট ও সালফেট। এই পদার্থ থেকে কিছু কিছু সাজি মাটি এবং 'খারী নুন' তৈরি হয়। সাজি মাটির গুণ সোডিয়ম কার্বনেটের জন্য, কাপড় পরিষ্কার করতে লাগে। খারী নুনে সোডিয়ম সালফেট আছে, বিরেচক ঔষধরূপে কিছু কিছু চলে। ক্ষার-লবণ থাকলে উর্বরতা লোপ পায়, সেজন্য এই পদার্থ ভূমির ব্যাধিরূপেই গণ্য হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী বণিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাতে পড়েছে এবং গভর্নমেন্টের আনুকূল্যে পঞ্জাব প্রদেশের এইরকম ভূমির একটি বিশাল অংশের ইজারা তারা পেয়েছে। সোডা-ক্ষার এবং সোডিয়ম সালফেট উৎপাদনই উদ্দেশ্য।

বেরার প্রদেশে বুলদানা জেলায় লোনার-হ্রদ এবং সিন্ধু প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে খয়েরপুর রাজ্যে ও তার নিকটবর্তী স্থানে কয়েকটি হ্রদের জলে সোডিয়ম কার্বনেট আছে। গ্রীষ্মকালে জল শুখিয়ে গেলে তা থেকে সোডার দানা উদ্ধার করা হয়।

শোরা (nitre, saltpetre)র উপাদান পোটাসিয়ম নাইট্রেট। বিহারে ত্রিহুত অঞ্চলে এবং পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কয়েকটি স্থানে মাটি থেকে শোরা পাওয়া যায়। জলে গলিয়ে বার বার কেলাসিত করলে তা থেকে পরিষ্কৃত শোরা তৈরি হয়। শোরার উৎপত্তির কারণ — মাটির সঙ্গে মিশ্রিভ গলিত জৈব পদার্থ, যেমন কাঠের ছাই এবং গবাদি পশুর মলমূত্র। ভূমিস্থ ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় শেষোক্ত পদার্থ থেকে অ্যামোনিয়া হয় এবং আর এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে তা নাইট্রিক আসিডে পরিণত হয়ে ছাইএর পোটাসিয়ম কার্বনেটের সঙ্গে মিশে শোরা উৎপন্ন করে।

নাইট্রিক অ্যাসিড, বারুদ, আতশবাজি প্রভৃতি করবার জন্য শোরা লাগে। এককালে ভারতীয় শোরা রাশি পরিমাণে ইওরোপে চালান যেত, কিন্তু দক্ষিণ

আমেরিকার চিলি (Chile) প্রদেশের ভূমিজাত সোডিয়ম নাইট্রেটের চলন হওয়ায় ভারতীয় শোরার আদর কমে গেছে। তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য দেশে এখন অ্যামোনিয়া থেকে প্রচুর নাইট্রিক অ্যাসিড এবং তা থেকে শোরা তৈরি হচ্ছে। শোরা-গন্ধক-কয়লা-ঘটিত বারুদও আজকাল প্রায় উঠে গেছে। এই সব কারণে স্বভাবজাত শোরার আর পূর্বের প্রতিপত্তি নেই।

১৬। ম্যাংগানিজ, নিকেল, কোবল্ট, টংস্টেন, মলিব্‌ডেনম

উপরের নামগুলি বিভিন্ন ধাতুবাচক। বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত ইস্পাত তৈরির জন্য এই সব ধাতু লোহার সঙ্গে মেশানো হয়। ম্যাংগানিজ ছাড়া অন্যগুলির খনিজ এদেশে খুব কম পাওয়া যায়।

ম্যাংগানিজ (manganese)-যুক্ত খনিজ এদেশে অনেকরকম আছে, তার মধ্যে প্রধান—সিলোমিলেন (psilomelane), ব্রাউনাইট (braunite) ও পাইরোলুসাইট (pyrolusite)। কতকগুলি পাথরের মতন শক্ত, কতকগুলি খড়ির মতন নরম, রং কাল অথবা ব্রাউন-কাল, কখনও কখনও অল্প ধাতুতুল্য উজ্জলতা দেখা যায়। এদের প্রধান উপাদান ম্যাংগানিজ-অক্সিজেনের বিবিধ যৌগিক, তার সঙ্গে অল্লাধিক সিলিকা, লৌহ অক্সাইড প্রভৃতিও মিশ্রিত থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় খনিজই এদেশে বেশী, কিন্তু সাধারণত সবগুলিই বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ধাতুর পরিমাণ অনুসারে খনিজের মূল্যের তারতম্য হয়। যাতে শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ ম্যাংগানিজ আছে তাই ব্যবহারের উপযুক্ত।

এদেশে ম্যাংগানিজ-খনিজের প্রধান ভাণ্ডার মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ভাণ্ডারা ছিন্দোআরা, জব্বলপুর ও নাগপুর জেলা। তার পরেই মাদ্রাজ প্রদেশের বেলারি জেলায় সন্দুর রাজ্য এবং ভিজিগাপটম। তার পর বিহারে মানভূম, সিংহভূম ও হাজারিবাগ জেলা, উড়িষ্যায় গাংপুর, ময়ূরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি ও কেওঞ্ঝর, বোম্বাই,

প্রদেশের পাঁচমহল অঞ্চল, মধ্যভারতে ঝালনা, এবং মাইসোরে চিতলদ্রুগ ও শিমোগা।

সমস্ত পৃথিবীতে যত ম্যাংগানিজ উদ্ধৃত হয় তার এক-তৃতীয়াংশ ভারতজাত। ভারতের একমাত্র সমকক্ষ রাশিয়া। ইং ১৯৩৮ সালে এদেশের খনি থেকে যা তোলা হয় তার মোট মূল্য ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। বেশীর ভাগ ইওরোপ আর জাপানে রপ্তানি হয়, অল্প ভাগই এদেশে কাজে লাগানো হয়।

ম্যাংগানিজের প্রধান প্রয়োগ — বিশেষপ্রকার ইস্পাতের উপাদানরূপে। এদেশে টাটার লৌহ-কারখানায় ফেরো-ম্যাংগোনিজ (ferro-manganese) তৈরী হচ্ছে। এই সংকরধাতু লোহার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে ম্যাংগানিজ স্টীল প্রস্তুত হয়। ম্যাংগানিজ-খনিজ থেকে এদেশে পোটাসিয়ম পারম্যাংগানেট তৈরি হচ্ছে, দূষিত জল শোধনের জন্য এবং ঔষধরূপে তার ব্যবহার হয়। এই খনিজ — বিশেষত পাইরোলুসাইট— আরও অনেক কর্মে লাগে, যেমন বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বা ড্রাইসেল নির্মাণে, দেশলাইএর উপকরণরূপে, এবং কাচ বর্ণহীন করবার জন্য।

নিকেল (nickel)এর খনিজ বিহারে মানভূম জেলায়, রাজপুতানায় আলোআর ও জয়পুরে, কাশ্মীরে, ত্রিবাঙ্কুরে, এবং মাইসোরে কোলার-খনিতে অত্যল্প পাওয়া যায়। এদেশে জারমন সিলভার তৈরি এবং মুদ্রার সঙ্গে মিশ্রণের জন্য যা দরকার হয় সমস্তই উত্তর আমেরিকা থেকে আসে।

কোবল্ট (cobalt)এর খনিজ উড়িষ্যায় কালাহাণ্ডি অঞ্চলে, ত্রিবাঙ্কুরে এবং রাজপুতানায় জয়পুরের কাছে অত্যল্প পাওয়া যায়। এককালে জয়পুরে 'সেহতা' নামক খনিজ (কোবল্ট সালফাইড) দিয়ে মৃৎপাত্রাদির উপর নীল মিনার কাজ হ'ত, কিন্তু এখন বিদেশী কোবল্ট-ঘটিত উপকরণই চলে।

টংস্টেন (tungsten) ধাতুর প্রধান খনিজের নাম উলফ্রাম (wolfram)। এর উপাদান লৌহ টংস্টেট, তার সঙ্গে কিছু ম্যাংগানিজও থাকে। বর্মাতে এই খনিজ প্রচুর আছে, সেখান থেকে ইওরোপে বিস্তর চালান যেত। এদেশে

সিংহভূম জেলায়, নাগপুরের কাছে, ত্রিচিনাপলিতে, এবং রাজপুতনায় যোধপুরে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। টংস্টেনের প্রধান প্রয়োগ— বিজলী বাতির ফিলামেণ্ট এবং টংস্টেন-স্টীল নামক ইস্পাত তৈরির জন্য।

মলিব্‌ডেনম (molydenum) এর প্রধান খনিজ মলিব্‌ডেনাইট (molybdenite, মলিব্‌ডেনম ডাইসালফাইড)। বর্মা থেকে প্রচুর চালান যেত। এদেশে মাদ্রাজ প্রদেশে গোদাবরী এজেন্সীতে, ত্রিবাঙ্কুরে, রাজপুতানায় কিষনগড়ে এবং বিহারে হাজারিবাগ ও মানভূম জেলায় অত্যল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ধাতুর প্রধান প্রয়োগ ইস্পাত তৈরির জন্য।

১৭। লোহা

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি কোনও আর্য জাতি কর্তৃক লোহা তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনেকের মতে ভারতের আর্যপূর্ব কোনও জাতিই আবিষ্কারক। তার বহু পূর্বে ইজিপ্ট ও চীন দেশে অলংকাররূপে অল্পস্বল্প লোহার চলন ছিল, কিন্তু সে লোহা সম্ভবত খনিজ থেকে প্রস্তুত নয়, উল্কাপিণ্ডজাত। মহেঞ্জোদারোতে (খ্রী-পূ ৩০০০ বর্ষ) তামার অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে কিন্তু লোহা পাওয়া যায় নি। বেদে বহুস্থানে 'অয়স্‌' ও 'লোহ' শব্দ আছে, তার সাধারণ অর্থ লোহা, কিন্তু অন্য ধাতুও হ'তে পারে। লোহার জিনিস সহজেই মরচে প'ড়ে নষ্ট হয়, সেজন্য হয়তো বহু স্থানে পুরাকালীন নিদর্শন লোপ পেয়েছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় ধাতুরূপে লোহা অতি বিরল। কিন্তু লৌহধাতুময় উল্কাপিণ্ড অনেক পাওয়া গেছে, তাতে সাধারণত কিছু নিকেল মিশ্রিত থাকে। জাহানগীরের রোজনামচায় একটি উল্কাপাতের বিবরণ আছে, তার পিণ্ড থেকে তিনি তলোয়ার গড়িয়েছিলেন।

ভূত্বকের উপাদানে লোহার পরিমাণ কম নয় — শতকরা ৫ ভাগের উপর। তথাপি শুধু কয়েকপ্রকার খনিজ থেকেই লোহা তৈরির খরচ পোষায়। এদেশে

প্রধানত যা থেকে হয় তার নাম হিমাটাইট (haematite) বা লোহাপাথর। এর প্রধান উপাদান ফেরিক অক্সাইড, তার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্য পদার্থও মিশ্রিত থাকে। এই পাথর খুব শক্ত, ভারী, রং আরক্ত কাল, অল্প ধাতুতুল্য উজ্জ্বলতা দেখা যায়। বিহারে সিংহভূম ও মানভূম জেলায় এবং উড়িষ্যায় ময়ূরভঞ্জ, বোনাই ও কেওঞ্ঝর রাজ্যে হিমাটাইটের বিশাল ভাণ্ডার আছে, টাটানগর ও কুলটির কারখানায় তা থেকেই লোহা হয়। উক্ত অঞ্চলের কতকগুলি পাহাড় আগাগোড়া হিমাটাইটে গঠিত। বিশুদ্ধ ফেরিক অক্সাইডে শতকরা ৭০ ভাগ লোহা থাকে। উক্ত দুই কারখানায় যে হিমাটাইট ব্যবহার করা হয় তাতে গড়ে ৬২ ভাগ লোহা আছে, বেছে নিলে ৬৯ ভাগ পর্যন্ত পাওয়া যায়। অন্য কোনও দেশে এত ভাল হিমাটাইট এমন ভূরিপরিমাণে পাওয়া যায় না। মাইসোরে কাদুর জেলায় বাবাবুদান পাহাড়েও প্রচুর হিমাটাইট আছে, তা থেকে ভদ্রাবতীর কারখানায় লোহা তৈরি হয়। বঙ্গদেশে বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়, বিহারে ভাগলপুর, লোহারডাঙা ও হাজারিবাগ জেলায়, এবং মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, বোম্বাইপ্রদেশ, পঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপুতানা প্রভৃতির নানা স্থানে হিমাটাইট পাওয়া যায়।

আজকাল এদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টন হিমাটাইট উদ্ধৃত হয়। তার এক-তৃতীয়াংশ জাপানে চালান যেত। ইং ১৯৩৮ সালে এদেশে ১৫ লক্ষ টনের উপর লোহা তৈরি হয়, তারও অনেকটা জাপানে যায়। ইংল্যাণ্ডে ও ভারতীয় হিমাটাইট আর লোহা রপ্তানি হয়।

সাধারণ প্রয়োগে সোনা বললে যেমন খাঁটী আর খাদমিশ্রিত সবরকম সোনাই বোঝায়, লোহা-শব্দও সেইরকম ব্যাপক অর্থে চলে। আজকাল যতরকম লোহার চলন আছে তাদের মোটামুটি ৪ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) ঢালা-লোহা (pig iron)।—চূড়াকার চুল্লী (blast furnace)তে লোহাপাথর থেকে যা তরল অবস্থায় নিষ্কাশিত হয়। এই লোহায় শতকরা ২·২ থেকে ৪·৫ ভাগ কার্বন এবং অল্প সিলিকন, গন্ধক, ফসফরস ও ম্যাংগানিজ থাকে। এইসব খাদের কতকটা লোহাপাথর থেকে, কতকটা কয়লা আর চুনেপাথর থেকে

আসে। অন্য শ্রেণীর লোহার চেয়ে ঢালা-লোহা কম তাপে গলে। এই লোহা কঠিন ও ভারসহ, কিন্তু সহজে ভাঙে। এ থেকে রেলিং থাম ইত্যাদি হয়, কিন্তু কড়ি বরগা হব না।

(২) পেটা-লোহা (wrought iron)।— এতে কার্বনের পরিমাণ শতকরা ০·১২ থেকে ০·২৫, অন্যান্য খাদও খুব কম। ঢালা-লোহা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোধন করলে এই লোহা হয়। পেটা-লোহা গলাতে প্রখর তাপ লাগে। লাল ক'রে তাতিয়ে পিটলে এক খণ্ডের সঙ্গে আর এক খণ্ড জুড়ে যায়। মাইল্ড স্টীল এবং সাধারণ ইস্পাতেরও এই গুণ আছে, কিন্তু ঢালা-লোহা এরকমে জোড়া যায় না। এদেশের প্রাচীন মন্দিরাদিতে যে লোহার কড়ি ইত্যাদি দেখা যায় তা পেটা-লোহার খণ্ড জুড়ে গড়া! এই লোহা নমনীয়, বাঁকালে সহজে ভাঙে না, সেজন্য কামারের কাজের উপযুক্ত। এ থেকে পাতলা পাত সহজে করা যায়। রাংএর লেপ দেওয়া লোহার পাতের সাধারণ নাম 'টিন'।

(৩) ইস্পাত (carbon steel)।— এতে শতকরা ০·১৫ থেকে ১·৫ ভাগ কার্বন থাকে। ঢালা-লোহা থেকে অতিরিক্ত কার্বন দূর ক'রে অথবা পেটা-লোহার সঙ্গে আরও কার্বন মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি হয়। প্রথম পদ্ধতিই বেশী প্রচলিত। মাইল্ড স্টীল (mild steel) নামে যা চলে তাতে কার্বন কিছু কম থাকে, তা দিয়ে রেল, কড়ি, বরগা, পাটি, শিক, চাদর প্রভৃতি তৈরি হয়। মাইল্ড স্টীল আর পেটা লোহাতে বেশী প্রভেদ নেই। সাধারণ ইস্পাতে অপেক্ষাকৃত বেশী কার্বন থাকে, ইস্পাতের প্রয়োগ অনুসারে কার্বনের তারতম্য করা হয়। ইস্পাত লাল ক'রে তাতিয়ে সহসা জলে ডোবালে খুব কঠোর আর ভঙ্গুর হয়, তার পর যদি আবার গরম করা হয় তবে কঠোরতা ও ভঙ্গুরতা কমে। এই প্রক্রিয়ার নাম পান দেওয়া (tempering)। উকো, ছুরি, কাঁচি, স্প্রিং প্রভৃতি বিভিন্ন তাপে পান দেওয়া হয়। মাইল্ড স্টীল, পেটা-লোহা আর ঢালা-লোহা এই রকমে কড়া বা নরম করা যায় না।

(৪) সংকর ইস্পাত (alloy steel)।— লোহার সঙ্গে ম্যাংগানিজ, ক্রোমিয়ম

প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে এই শ্রেণীর ইস্পাত তৈরি হয়। ম্যাংগানিজ-স্টীল খুব শক্ত, নানা যন্ত্রনির্মাণে লাগে। নিকল-স্টীল খুব ঘাতসহ বা চিমড়ে (tough), সহজে ফাটে না, সেজন্য তা দিয়ে যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতির বর্ম তৈরি হয়। লোহার সঙ্গে নিকেল আর ক্রোমিয়ম মিশিয়ে স্টেনলেস স্টীল তৈরি হয়, তাতে সহজে মরচে পড়ে না। ক্রোম-স্টীল ও টংস্টেন-স্টীল খুব কড়া, ব্যবহারকালে তেতে উঠলেও সাধারণ ইস্পাতের মতন নরম হয়ে যায় না, সেজন্য লেদ প্রভৃতি যন্ত্রে কাটবার অস্ত্ররূপে চলে। টাইটেনিয়ম ও মলিব্‌ডেনম মিশ্রিত ইস্পাতেরও বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ আছে।

যে চুল্লীতে লোহাপাথর থেকে লোহা তৈরি হয় (blast furnace) তা দেখতে কতকটা চূড়া বা চিমনির তুল্য, ৫০ থেকে ১০০ ফুট উঁচু। তার ভিতরে জ্বলন্ত কোক-কয়লা থাকে, নীচ থেকে প্রচণ্ড জোরে হাওয়া দেওয়া হয়। উপর থেকে মাঝে মাঝে লোহাপাথর, চুনেপাথর আর কয়লা ঢালা হয়। প্রখর তাপে কয়লার সংস্পর্শে হিমাটাইট বিজারিত হয়, অর্থাৎ তার অক্সিজেন দূর হয়, এবং গলিত লোহা নীচে জমে। হিমাটাইটের অন্যান্য উপাদান, কয়লার ছাই আর চুনেপাথর গ'লে গিয়ে লোহার উপরে গাদ বা ধাতুমল (slag) হয়ে জমে এবং একটা নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চুল্লীর নীচ থেকে তরল লোহা বার ক'রে বালির ছাঁচে ঢালা হয়। কোক বা পাথুরে কয়লার বদলে কাঠকয়লা দিয়ে লোহা করলে তার বিশুদ্ধি বেশী হয়। মাইসোরে ভদ্রাবতীর কারখানায় কাঠ-কয়লাই চলে।

এককালে এদেশের অনেক স্থানে দেশী পদ্ধতিতে লোহা নিষ্কাশিত হ'ত। দেশী চুল্লী বা ভাটির খাড়াই ২।৩ হাত মাত্র, তাতে লোহাপাথরের সঙ্গে কাঠকয়লা ও চুনেপাথর ভ'রে হাতে টানা জাঁতা বা ভস্ত্রা দিয়ে হাওয়া দেওয়া হ'ত। নিষ্কাশিত লোহা বার বার তাতিয়ে আর পিটিয়ে তা থেকে নরম লোহা অথবা ইস্পাত করা হ'ত। আধুনিক বেসেমার (Bessemer) পদ্ধতিতে গলিত ঢালা লোহার মধ্যে হাওয়া চালিয়ে অতিরিক্ত কার্বন পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিও পূর্বে এদেশে

ছিল, বেসেমার সাহেব মাদ্রাজ অঞ্চলের দেশী লোহকারের কাছে শিখে ইং ১৮৫৫ সালে ইংল্যাণ্ডে স্বনামে প্রবর্তিত করেন।

সংস্কৃত গ্রন্থে নানারকম লোহার নাম পাওয়া যায় — অশ্মসার, কান্তলোহ, কালায়স, তীক্ষ্ণলোহ ইত্যাদি। সম্ভবত প্রথমটি ঢালা-লোহা এবং শেষেরটি ইস্পাত, অন্যগুলি কি তা ঠিক বোঝা যায় না। এককালে ভারতীয় লোহা আর ইস্পাতের জগদ্ব্যাপী খ্যাতি ছিল। এদেশের ইস্পাত wootz নামে বিদেশে চালান যেত, তা থেকেই দামস্কস ও তোলেদোর বিখ্যাত তলোয়ার তৈরি হ'ত। শেফিল্ডের কারখানাগুলিতেও ভারতীয় ইস্পাতের চলন ছিল। দিল্লিতে কুতবমিনারের কাছে যে লোহস্তম্ভ আছে তা ভিনসেণ্ট-স্মিথের মতে চতুর্থ শতকে চন্দ্র নামক এক রাজা (অনেকে বলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) কর্তৃক সম্ভবত মথুরায় স্থাপিত হয়, পরে ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে তোমর-বংশীয় কোনও রাজা তা উঠিয়ে এনে দিল্লিতে রোপণ করেন। এই স্তম্ভের লোহা অতি বিশুদ্ধ, ওজন ৬ টনের বেশী। সেকালে কি কৌশলে এত বড় লোহার জিনিস গড়া হয়েছিল তা আধুনিক বিজ্ঞানীদের আশ্চর্যের বিষয়।

১৮। তামা, রাং, দস্তা, সীসে

অতি প্রাচীন কালে লোহা আবিষ্কারের আগেই মানুষ **তামা**র ব্যবহার শিখেছিল। তামা স্থানে স্থানে ধাতুরূপেও পাওয়া যায়। কতকগুলি খনিজ থেকে কাঠকয়লা আর তাপের সাহায্যে সহজেই তামা বার হয়, ৬।৭ হাজার বৎসর আগেকার মানুষ তা শিখেছিল। অনেক স্থানে তামা আর রাং যুক্ত খনিজ একত্র পাওয়া যায়। এই মিশ্র খনিজ থেকে ব্রোঞ্জ বা কাঁসা তৈরি হ'ত এবং তার অস্ত্রাদি অমিশ্র তামার অস্ত্রের চেয়ে মজবুত হ'ত। প্রাচীন ব্রোঞ্জের অস্ত্রে সাধারণত ৯ ভাগ তামা ১ ভাগ রাং দেখা যায়।

ভারতবর্ষে তামা বেশী নেই। কাশ্মীরে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েক জায়গায় গুটির আকারে তামা-ধাতু পাওয়া গেছে, কিন্তু এরকম তামা খুব বিরল। এদেশে অনেক স্থানে তামা-যুক্ত খনিজ পাওয়া যায়, যেমন বিহারে সিংহভূম, হাজারিবাগ

ও সাঁওতাল পরগনায়, যুক্তপ্রদেশে কুমায়ুন ও গাঢ়োআল অঞ্চলে, সিকিমে, রাজপুতানায় আজমির, আলোআর ও উদয়পুরে, এবং পাঞ্জাবে কুলু অঞ্চলে। এর মধ্যে কেবল সিংহভূম জেলায় তামা প্রস্তুত হয়। পূর্বে রাখা নামক স্থানের খনিজ থেকে হ'ত, এখন প্রধানত মোসাবনির খনিজ থেকে হয়। ঘাটশিলার কাছে তার কারখানা আছে। নিকটবর্তী অনেক জায়গায় পূর্বে তামা তৈরি হ'ত, এখনও তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

এদেশে যে খনিজ থেকে তামা তৈরি হয় তার নাম ক্যাল্কোপাইরাইট (chalcopyrite), উপাদান—তাম্র-লোহ সালফাইড। মোসাবনির খনিজে তামার পরিমাণ অল্প, ২ থেকে ৪ ভাগ মাত্র। বিশেষ প্রক্রিয়ায় খনিজ থেকে আবর্জনা বাদ দিয়ে তামার ভাগ বাড়ানো হয়, তারপর চুল্লীতে পুড়িয়ে অন্যান্য উপাদান থেকে তামা পৃথক্ করা হয়। এদেশে এখন বৎসরে প্রায় ৬০০০ টন তামা উৎপন্ন হয়। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পিতলও তৈরি হচ্ছে।

রাং, দস্তা এবং সীসে—এই তিন ধাতুর খনিজ বর্মায় ও মালয় উপদ্বীপে প্রচুর আছে, যুদ্ধের পূর্বে সেখানেই ধাতু নিষ্কাশিত হ'ত। এদেশে অল্প যা পাওয়া যায় তা থেকে ধাতুনিকাশনের কোনও ব্যবস্থা এখন নাই।

রাং (tin) এর সংস্কৃত নাম রঙ্গ বা বঙ্গ। রাং-অক্সিজেন যুক্ত ক্যাসিটেরাইট (cassiterite) নামক খনিজ থেকে এই ধাতু পাওয়া যায়। বিহারে হাজারিবাগ জেলায়, বোম্বাই প্রদেশে ধারোআর, পালানপুর ও নারুকোট অঞ্চলে, এবং মাদ্রাজ প্রদেশে ত্রিচিনাপলি জেলায় অল্প পাওয়া যায়।

দস্তা (zinc)র সংস্কৃত নাম যশদ। দস্তা-গন্ধক-যুক্ত জিঙ্ক-ব্লেণ্ড (zinc-blende) নামক খনিজ থেকে এই ধাতু পাওয়া যায়। বিহারে হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগনায়, যুক্তপ্রদেশে দেরাদুনের কাছে, পঞ্জাবে কাংড়া জেলায়, কাশ্মীরে, রাজপুতানায় মিবার ও যোধপুরে, এবং মাদ্রাজ প্রদেশে করনুল জেলায় কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। সম্প্রতি রাজপুতানায় জয়পুর রাজ্যে একটি বড় আকরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সীসে (lead)র সংস্কৃত নাম সীস, সীসক, নাগ। এই ধাতু সীস-গন্ধক-যুক্ত গ্যালিনা (galena) নামক খনিজ থেকে পাওয়া যায়। গ্যালিনায় সাধারণত কিছু রুপো থাকে, অনেক স্থলে তা উদ্ধার করা হয়। এদেশে এককালে সীসে তৈরি হ'ত, কিন্তু বিদেশ ও বর্মা থেকে সস্তা সীসে আসায় তা বন্ধ হয়ে গেছে। বিহারে হাজারিবাগ, সিংহভূম ও মানভূম জেলায়, উড়িষ্যায় সম্বলপুরে, ময়ূরভঞ্জ বোনাই ও কেওঞ্ঝর রাজ্যে, মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে, রাজপুতানায়, মাদ্রাজ প্রদেশে, নিজাম রাজ্যে, এবং মাইসোরে গ্যালিনা পাওয়া যায়। সম্প্রতি রাজপুতানায় মিবার অঞ্চলে গ্যালিনার একটি বড় আকর আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্যালিনার চূর্ণ এদেশে চোখে লাগাবার সুর্মা রূপে চলে, কিন্তু আসল সুর্মা রসাঞ্জন বা আন্টিমনি-গন্ধক-যুক্ত স্টিবনাইট (stibnite)।

১৯। সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনম

সোনা মৌলিক অবস্থায় অর্থাৎ ধাতুরূপেই পাওয়া যায়, সেজন্য অতি প্রাচীন কালে অন্যান্য ধাতুর পূর্বেই সোনা আবিষ্কৃত হয়েছিল। নবোপলীয় (neolithic) যুগে—যখন তামা লোহা অজ্ঞাত ছিল, উপলখণ্ড ঘ'ষে মেজে মানুষের প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি গড়া হ'ত—তখনও সোনার চলন ছিল। ৭।৮ হাজার বৎসর পূর্বের যেসব প্রত্নসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঙ্গে সোনার গহনাও পাওয়া গেছে। সংস্কৃতে সোনার অনেক নাম—কনক, কাঞ্চন, চামীকর, জাম্বুনদ, তপনীয়, রুক্ম, শাতকুম্ভ, সুবর্ণ, স্বর্ণ, হিরণ্য, হেম ইত্যাদি।

সোনা সাধারণত কোআর্ট্‌সের সঙ্গে গ্রথিত বা সংলগ্ন থাকে। এইরূপ স্বর্ণধর (auriferous) কোআর্ট্‌স যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণিত হয়ে জলস্রোতে বাহিত হয় তখন সোনার কণা বা দানা বালি আর নুড়ির সঙ্গে নদীপথে বা নদীপ্লাবিত ভূমিতে বিকীর্ণ হয়। এইরকম বালি আর নুড়ি থেকেই এককালে সোনা সংগ্রহ করা হ'ত। এই জলবাহিত সোনার পরিমাণ সাধারণত খুব কম, বিস্তর বালি ধুয়ে ধুয়ে অল্প কিছু স্বর্ণকণা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দৈবক্রমে গুটিকতক বড় ডেলাও মিলতে

পারে। যে জায়গায় অনেক কাল থেকে এইরকমে সোনা উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য ডেলা আর দানা নিঃশেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু সূক্ষ্ম কণাই প'ড়ে আছে। আধুনিক বৃহৎ ব্যবস্থায় আকর থেকে স্বর্ণধর কোর্ট্স তুলে এনে তা থেকেই ধাতু উদ্ধার করা হয়।

এদেশে সব চেয়ে বড় সোনার খনি আছে মাইসোরে কোলার অঞ্চলে। সেখানে ভূনিম্নস্থ একটি কোঅর্ট্সের শিরা (vein) থেকেই অধিকাংশ সোনা বার করা হয়। এই প্রস্তরময় শিরার দৈর্ঘ্য ৪ মাইলের কিছু বেশী, কিন্তু বেধ ৪ ফুট মাত্র। এই অঞ্চলে প্রাচীন কালে সোনা তোলা হ'ত, তার চিহ্ন দেখেই বিদেশী স্বর্ণান্বেষীর দৃষ্টি এদিকে পড়ে। এখন ৪টি বিলাতী কম্পানি এখানে খনি খুঁড়ে পাথর তুলে তা থেকে প্রচুর সোনা বার করছে। কোলার-খনি খুব গভীর, স্থানে স্থানে ৫ হাজার ফুট পর্যন্ত। মাইসোরে অনন্তপুর এবং নিজাম রাজ্যে হুটি অঞ্চলের খনি থেকেও আধুনিক উপায়ে সোনা বার করা হচ্ছে। সিংহভূম অঞ্চলে লওআ-খনিতেও কিছু কিছু কাজ চলছে।

আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং মাইসোরের অনেক নদীর বালিতে স্বর্ণকণা আছে। ৩৫ বৎসর পূর্বে Dr. J. M. Maclaren তন্ন তন্ন সন্ধান ক'রে মত প্রকাশ করেছিলেন যে এই সোনার পরিমাণ অতি কম, তাতে ইওরোপীয় দৃষ্টি দেবার দরকার নেই ('in no case sufficiently rich to warrant European examination')। তথাপি স্থানীয় দরিদ্র অধিবাসীরা এখনও কিছু কিছু সোনা উদ্ধার করে। তাদের পদ্ধতি অতি সরল — পাতলা কাঠের একটি ডালা, তাতে কিছু বালি রেখে জল মিশিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধোয়া হয়। সোনার কণা বালির চেয়ে ভারী, সেজন্য নাড়া পেয়ে বালি জলের সঙ্গে মিশে ক্রমশ বেরিয়ে যায়, এবং বার বার ধোয়ার পর অবশেষে ডালাতে শুধু সোনার কণা থাকে। সমস্ত দিন খেটে যে সোনা পাওয়া যায় তার দাম হয়তো কয়েক আনা মাত্র। সুবর্ণরেখা নদীর বালি থেকে এখনও এই উপায়ে সোনা বার করা হয়। শোণ নদীর প্রাচীন নাম হিরণ্যবাহ, সম্ভবত সেকালে তার বালি থেকেও সোনা বার করা হ'ত।

আধুনিক পদ্ধতিতে স্বর্ণধর কোঅর্ট্সের সূক্ষ্ম চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে বড় বড় তামার চাদরের উপর দিয়ে স্রোতের মতন বওয়ানো হয়। তামার চাদরে পারা মাখানো থাকে, তাতে সোনার কণা আটকে যায়। তারপর পারা চেঁচে নিয়ে পাতনযন্ত্রে রেখে তাপ দেওয়া হয়। পারা বাষ্পাকারে পৃথক্ হয়ে অন্য পাত্রে জমে, পাতনযন্ত্রে শুধু সোনা প'ড়ে থাকে। পাথরের গুঁড়ো থেকে সব সোনা পারায় আটক পড়ে না। পোটাসিয়ম বা সোডিয়ম সায়ানাইড মিশ্রিত জলে সোনা দ্রব হয়, সেজন্য সায়ানাইড-যোগে পাথরের গুঁড়ো থেকে অবশিষ্ট সোনা বার করা হয়। সোনার সঙ্গে সাধারণত কিছু রুপো মিশ্রিত থাকে, তাও বিশেষ প্রক্রিয়ায় পৃথক্ করা হয়।

ছ হাজার বৎসর পূর্বেও **রুপো**র চলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সংস্কৃত নাম রূপ্য, রৌপ্য, রজত। অনেক স্থানে রুপো মৌলিক অবস্থায় অর্থাৎ ধাতুরূপেই পাওয়া যায় এবং কয়েকপ্রকার খনিজে অন্য উপাদানের সঙ্গে রুপো সংযুক্ত থাকে। গ্যালিনায় এবং স্বাভাবিক সোনায় প্রায় রুপো থাকে। গ্যালিনা-জাত সীসে থেকে বিস্তর রুপো পৃথক্ করা হয়।

এদেশে রুপোর আকর এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। এখানকার গ্যালিনাতে কিছু রুপো আছে, কিন্তু আজকাল তা থেকে সীসে বা রুপো কিছুই বার করা হয় না। বর্মার সীসে থেকে প্রচুর রুপো পাওয়া যেত। কোলার প্রভৃতি খনির সোনা শোধন করবার সময় কিছু রুপো বার হয়।

প্ল্যাটিনম (platinum) ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে। এই ধাতু সোনার চেয়ে ভারী আর কঠিন, অত্যন্ত প্রখর তাপ ভিন্ন গলে না, ব্যবহারে মলিন হয় না, এবং সাধারণ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে ক্ষয় পায় না। এইসব গুণের জন্য নানা শিল্পে এবং বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে প্ল্যাটিনম অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দেখতে এমন কিছু সুন্দর নয়, অনেকটা রাংএর মতন, কিন্তু সোনার চেয়ে দামী আর ফ্যাশন-সম্মত, সেজন্য এথেকে বড়লোকের অলংকার তৈরি হয়।

প্ল্যাটিনমের প্রধান আকর রাশিয়ার ইউরাল প্রদেশে এবং কানাডায়। এদেশে খুব কম পাওয়া যায়। আসামে লখিমপুর জেলায় নদীর বালিতে সোনার সঙ্গে অল্প প্ল্যাটিনম আছে। মানভূম জেলায় এবং কোলার স্বর্ণখনিতেও কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। বর্মায় ইরাবতী নদীর বালি থেকে সোনার সঙ্গে অল্প প্ল্যাটিনম উদ্ধৃত হ'ত।

২০। পাথুরে কয়লা, পেট্রোলিয়ম

পাথুরে কয়লার উৎপত্তি গাছপালা থেকে, কিন্তু ঠিক কি ভাবে তা হয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে অতি প্রাচীন কালে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে প্লাবনের জন্য অরণ্যের উপর ক্রমশ মাটি বালি প্রভৃতির স্তর জমে, তার ফলে গাছপালা ভূমির অনেক নীচে প্রোথিত হয়ে যায়; অথবা জল-বাহিত উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ স্থানে স্থানে স্তরাকারে জমা হয় এবং তা কালক্রমে মাটি বালি প্রভৃতির স্তরে চাপা পড়ে। উদ্‌ভিদের প্রথম বিকার সম্ভবত ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা ঘটে, তারপর ক্রমবর্ধিত উপরিস্থ স্তররাশির প্রচণ্ড চাপ এবং ভূগর্ভের তাপ এই দুই কারণে উদ্‌ভিদ ক্রমশ কয়লায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তন ঘটতে বহু লক্ষ বৎসর লেগেছে। সব জায়গার কয়লার বয়সও সমান নয়। ৩-প্রকরণে যে গণ্ডোআনা পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে সেই পর্যায়ের স্তরে যে কয়লা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রাচীন, তার বয়স সম্ভবত কয়েক কোটি বৎসর। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং নিজাম রাজ্যের কয়লা এইপ্রকার। আসাম, পঞ্জাব ও বেলুচিস্থানের কয়লা অত প্রাচীন নয়। কয়লার পরিণতি যদিও ভূমির অনেক নীচে ঘটে তথাপি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক স্থানে কয়লার স্তর অপেক্ষাকৃত উপরে উঠে এসেছে।

কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে ভূমির ৩০।৪০ ফুট নীচে একটি গরান ও সুঁদরি কাঠের স্তর দেখা যায়। কাঠের লাল রং এখনও বজায় আছে। এককালে এখানে সুন্দরবনের তুল্য জঙ্গল ছিল, তারপর প্লাবনের ফলে তার উপর গভীর পলি পড়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো তার উপরে আরও পলি জমা হবে এবং কয়েক লক্ষ

বৎসর পরে এই কাঠ কয়লা হয়ে যাবে। শীতপ্রধান দেশে বহু স্থানে পীট (peat) নামে একরকম ব্রাউন বা কাল ফোঁপরা পদার্থ পাওয়া যায়, তা প্রধানত শেওলা প্রভৃতি জলজ বা জলাভূমিজাত উদ্‌ভিদের রূপান্তর। এদেশেও স্থানে স্থানে পীট পাওয়া যায়, কিন্তু অল্প। কয়লার প্রথম অবস্থা পীটের তুল্য। পাঞ্জাব, বিকানির, কচ্ছ প্রভৃতি কয়েক স্থানে লিগনাইট (lignite) নামে একরকম ব্রাউন কয়লা পাওয়া যায়। লিগনাইট কয়লার অর্ধপরিণত রূপ, সাধারণ কয়লার তুলনায় এতে কার্বনের ভাগ কম এবং অক্সিজেনের ভাগ বেশী। উদ্‌ভিদের শেষ পরিণতি পাথুরে কয়লা, কিন্তু তারও প্রকারভেদ আছে। একপ্রকার কয়লার নাম অ্যানথ্রাসাইট (anthracite), এতে কার্বনের ভাগ শতকরা ৯০এর উপর, জ্বাললে খুব তাপ হয় কিন্তু শিখা ও ধোঁয়া হয় না। এ কয়লা এদেশে নেই। আর এক-প্রকার কয়লা (bituminous coal) জ্বাললে শিখা আর ধোঁয়া হয়, এদেশের কয়লা প্রধানত এইপ্রকার। এখানকার ভাল কয়লায় কার্বনের ভাগ শতকরা ৫০।৬০। নিকৃষ্ট কয়লার মাটি পাথর প্রভৃতি উপাদান মিশ্রিত থাকে সেজন্য কার্বন আরও কম এবং তার ছাইও বেশী হয়।

এদেশের ভালো কয়লা রেলওয়ে, লোহার কারখানা এবং অন্যান্য বড় কারখানায় চলে। পাতনযন্ত্রে কয়লা চোয়ালে তা থেকে আলকাতরা আর গ্যাস বার হয়, কলকাতায় এই গ্যাস সরবরাহ হয়। পাতন যন্ত্রে যে কয়লা প'ড়ে থাকে তার নাম কোক (coke)। অন্য উপায়েও, যেমন কাঁচা কয়লা অল্প পুড়িয়ে, কোক তৈরি হয়।

ভারতবর্ষের প্রধান কয়লার খনি বঙ্গদেশে রানীগঞ্জ অঞ্চলে এবং বিহারে ঝরিয়া, বোকারো, গিরিডি এবং করনপুরা অঞ্চলে। আজকাল ঝরিয়া থেকেই সব চেয়ে বেশী কয়লা তোলা হয়। অন্যান্য প্রদেশে প্রধান খনিগুলির অবস্থান— আসামে লখিমপুর ও শিবসাগর জেলার দক্ষিণে মাকুম এবং তার নিকটবর্তী স্থানে, উড়িষ্যায় তালচেরে, মধ্যপ্রদেশে বেলারপুর, পেঁচ, মোহপানি ও কোরিয়ায়, নিজাম রাজ্যে সিংগারেনিতে, মধ্যভারতে উমরিয়ায়, পঞ্জাবে ঝিলম জেলায়, রাজপুতানায় বিকানিরে, এবং বেলুচিস্থানে সিবি জেলায়।

ইং ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে প্রায় ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টন কয়লা তোলা হয়, তার মূল্য প্রায় ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। এই কয়লার ৮১ লক্ষ টন রেলওয়েতে এবং ২৫ লক্ষ টন লোহার কারখানায় খরচ হয়।

পেট্রোলিয়ম (petroleum) এর উৎপত্তি উদ্‌ভিদ অথবা প্রাণী থেকে — অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রাণিজ উৎপত্তিই বেশী সম্ভবপর মনে করেন। কোন্ বস্তু থেকে কি প্রক্রিয়ায় এই পরিণতি ঘটেছে তার বিনিশ্চয় এখনও হয়নি।

সাধারণত ভূমির অনেক নিম্নস্থ বালির স্তর থেকে পেট্রোলিয়ম বার করা হয়, কিন্তু কোনও কোনও স্থানে উৎসের আকারেও নির্গত হয়। এই পদার্থ তরল বা পাঁকের মতন, দুর্গন্ধ, কাল, ব্রাউন বা সবুজ-ব্রাউন, অনেক সময় তার সঙ্গে গ্যাসও থাকে। অ্যাসফাল্ট বা বিটুমেন (asphalt, bitumen) নামে যে পদার্থ দক্ষিণ আমেরিকা, ত্রিনিদাদ এবং প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়, এবং হিমালয় প্রদেশে যে শিলাজতু সংগৃহীত হয় তাও এই জাতীয়।

পাতনযন্ত্রে চোয়ালে পেট্রোলিয়ম থেকে বহু পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। এই-সকল পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করলে পেট্রল, কেরোসিন, লুব্রিকেটিং অয়েল, ভ্যাসেলিন-জাতীয় পেট্রোলিয়ম-জেলি, প্যারাফিন অয়েল, শক্ত প্যারাফিন—যা দিয়ে বাতি তৈরি হয়, এবং পিচ (pitch) বা কৃত্রিম অ্যাসফাল্ট উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষে পেট্রোলিয়ম খুব কম পাওয়া যায়। আসামে ডিগবয় এবং পঞ্জাবে আটক অঞ্চলে যে খনি আছে তা থেকে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি গ্যালন পাওয়া যায়। এদেশের প্রয়োজন প্রায় ৫৫ কোটি গ্যালন। বর্মায় পেট্রোলিয়মের বিশাল ভাণ্ডার আছে, যুদ্ধের আগে প্রধানত সেখানকার কেরোসিন পেট্রল প্রভৃতিই এদেশের অভাব মেটাত। ভূবিজ্ঞানীরা আশা করেন ভবিষ্যতে হিমালয় প্রদেশে আরও পেট্রোলিয়ম আবিষ্কৃত হবে।

২১। রত্ন

রত্ন বা মণির মধ্যে প্রধান (precious stones) — হীরে, চুনি, নীলা, পান্না। আর সমস্তই উপরত্ন (semiprecious stones), কিন্তু ফ্যাশন ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সময়ে সময়ে উপরত্নও প্রাধান্য লাভ করে। মুক্তাপ্রবালাদি খনিজ নয়, সেজন্য আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

রত্নের তিনটি প্রধান লক্ষণ — মনোহারিতা, কঠোরতা ও দুর্লভতা। অর্থাৎ দেখতে সুন্দর হবে, এত কড়া হবে যে ব্যবহারে জেল্লা আর পালিশ নষ্ট হবে না, এবং এমন দাম হবে যে সামান্য লোকে কিনতে না পারে। সকল সভ্য দেশেই অতি প্রাচীন কাল থেকে রত্নের আদর আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকপ্রকার রত্নের বিবরণ পাওয়া যায়। এদেশের অসংখ্য লোকের বিশ্বাস যে বিশেষ বিশেষ রত্ন ধারণে শুভাশুভ ফললাভ হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশেও অনেকের অনুরূপ সংস্কার আছে।

অধিকাংশ রত্নের উৎপত্তি আগ্নেয় শিলায়। যে শিলা ভূগর্ভে তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শীতল হয়েছে তারই আনুষঙ্গিক কতকগুলি উপাদান রত্নরূপে কেলাসিত হ'তে পেরেছে। রূপান্তরিত শিলাতেও রত্ন দেখা যায়। রত্নধর শিলা যখন কালক্রমে প্রাকৃতিক কারণে বিশ্লিষ্ট হয় তখন বিচ্যুত রত্ন অনেক সময় জলবাহিত হয়ে নদীগর্ভে বা নদীসৈকতে প্রকীর্ণ হয়। হীরে চুনি নীলা প্রভৃতি সাধারণত এইরূপ প্রকীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। আবার অনেক রত্ন মূল শিলার সঙ্গেই গ্রথিত থাকে, যেমন পান্না ওপাল প্রভৃতি। বৃহৎসংহিতায় হীরকের অবস্থান সম্বন্ধে বলা হয়েছে — 'স্রোতঃ খনিঃ প্রকীর্ণকমিত্যাকরসম্ভবস্ত্রিবিধঃ' — নদী, খনি এবং প্রকীর্ণক এই ত্রিবিধ আকরসম্ভব।

আজকাল ভারতবর্ষে দামী রত্ন বেশী মেলে না, পুরাতন অনেক আকর নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন দক্ষিণ আফ্রিকা, বর্মা, সিংহল এবং অস্ট্রেলিয়া জাত রত্নই এদেশে বেশী চলে।

হীরে (হীরক, বজ্র, diamond)র উপাদান বিশুদ্ধ কার্বন, কঠোরতা অন্য সমস্ত পদার্থের চেয়ে বেশী। উৎকৃষ্ট হীরে স্বচ্ছ বর্ণহীন বা ঈষৎ নীলাভ, নিকৃষ্ট হীরে আপীত। হীরের উপর আলোক পড়লে রামধনুর মতন নানাবর্ণের রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। এককালে এদেশে অনেক হীরে পাওয়া যেত। কোহিনুর, গ্রেট মোগল, অরলফ (Orloff), পিট বা রিজেন্ট (Pitt, Regent) প্রভৃতি বিখ্যাত হীরে এদেশ থেকেই নানা হাত ঘুরে ইওরোপে পৌঁছেছে। নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত গোলকণ্ডার আকরে এখন আর হীরে নেই, কিন্তু মধ্যভারতে পান্না রাজ্যে এখনও কিছু পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিহারে পালামউ অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশে সম্বলপুর ও চান্দা জেলায়, মাইসোরে অনন্তপুরে, মাদ্রাজ প্রদেশে করনুল, কডাপা ও বেলারি জেলায় অল্পস্বল্প মেলে। দক্ষিণ আফ্রিকার হীরেই এখন এদেশে বেশী চলে।

এদেশে প্রাচীন কালে হীরে স্বভাবজ আকারেই রত্নরূপে চলত, সময়ে সময়ে সম্ভবত শুধু পালিশ করা হ'ত। গরুড়পুরাণে আছে—

কোট্যঃ পার্শ্বানি ধারাশ্চ ষড়ষ্টৌ দ্বাদশেতি চ।
উত্তুঙ্গসমতীক্ষ্ণাগ্রা বজ্রস্যাকরজা গুণাঃ॥

অর্থাৎ বজ্রের আকরজ লক্ষণ — ষট্ কোটি (কোণ), অষ্ট পার্শ্ব (face), দ্বাদশ ধার (edge), শিখরগুলি উঁচু ও সমতীক্ষ্ণ। এই বর্ণনা স্বাভাবিক অষ্টতলক (octahedral) হীরের লক্ষণানুযায়ী।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'রত্নপরীক্ষা' পুস্তকে লিখেছেন — 'এদেশে অন্ততঃ খ্রী. নবম শতাব্দী পর্যন্ত হীরা কাটা জানা ছিল না'। ইওরোপে হীরে কাটা আরম্ভ হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে তার অনেক আগেই কাটবার কৌশল ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

হীরের গুঁড়ো দিয়েই হীরে কাটা আর পালিশ করা হয়। অত্যন্ত দাগী হীরে যা রত্নরূপে চলে না, এবং কাল হীরে (bort) নানারকম কাজে লাগে, যেমন কাচ কাটবার কলম এবং পাথর ভেদ করবার যন্ত্র তৈরি করতে।

চুনি (পদ্মরাগ, মাণিক্য, ruby) এবং নীলা (নীলকান্ত, নীলক, ইন্দ্রনীল, sapphire) এই দুই রত্নেরই উপাদান অ্যালিউমিনা বা অ্যালিউমিনিয়ম অক্সাইড। কুরুবিন্দও (৩১-প্রকরণ) এই পদার্থ। বিশুদ্ধ কুরুবিন্দ স্বচ্ছ ও বর্ণহীন, তাতে ঈষৎ ক্রোমিয়ম অক্সাইড থাকলে লাল চুনি হয়, ঈষৎ টাইটেনিয়ম লোহ ও কোবল্ট অক্সাইড প্রভৃতি থাকলে নীল রংএর নীলা হয়। তারামণি (star sapphire) নামে একরকম নীলা আছে, গোলপৃষ্ঠ ক'রে কাটলে তার মধ্যে ছয় রশ্মিযুক্ত একটি তারা দেখা যায়। এদেশে চুনি পাওয়া যায় না, বর্মা সিংহল ও শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) জাত চুনিই চলে। শ্রেষ্ঠ চুনি — যাকে বলা হয় কপোত-রক্তবর্ণ অর্থাৎ টকটকে লাল, বর্মাতেই পাওয়া যায়। সিংহলের চুনি সাধারণত ঈষৎ বেগনী, শ্যামদেশের আর একটু বেগনী। নীলা প্রধানত সিংহল থেকে আসে, বর্মা থেকেও কিছু আসত। কাশ্মীরে অল্প পাওয়া যায়। বর্ণহীন, এবং বেগনী, সবুজ, হলদে প্রভৃতি বর্ণেরও কুরুবিন্দ মেলে, কিন্তু বিরল। কুরুবিন্দ-জাতীয় রত্নগুলির কঠোরতা হীরের চেয়ে কম কিন্তু আর সব রত্নের চেয়ে বেশী।

প্রায় ৪০ বৎসর থেকে সুইটসারল্যাণ্ড জার্মানি এবং ফ্রান্সে কৃত্রিম চুনি নীলা এবং অন্যান্য বর্ণের কুরুবিন্দ প্রচুর তৈরি হচ্ছে। অক্সিহাইড্রোজেন শিখার প্রচণ্ড তাপে অ্যালিউমিনা প্রভৃতি গলিয়ে এইসব কৃত্রিম (synthetic) রত্ন প্রস্তুত হয়। এদের উপাদান গুরুত্ব কঠোরতা বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ স্বভাবজ রত্নের সমান, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ভিন্ন প্রভেদ ধরা শক্ত। আজকাল এদেশে কৃত্রিম রত্ন খুব চলছে, সাধারণে এবং অনেক জহরীও আসল আর কৃত্রিমের ভেদ বুঝতে পারে না।

ঘড়ি প্রভৃতি যন্ত্রের সূক্ষ্ম চলন্ত অঙ্গের ঘর্ষণ কমাবার জন্য চুনি নীলার ছোট টুকরো বসানো হয়। আজকাল এই উদ্দেশ্যে কৃত্রিম রত্নও চলছে।

পান্না (মরকত, হরিন্মণি, গারুত্মত, emerald) এবং অ্যাকোআমেরিন (aquamarine) দুই মণিরই সাধারণ নাম বেরিল (beryl), উপাদানও এক— বেরিলিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম সিলিকেট। কঠোরতা চুনি নীলার চেয়ে কম।

বিশুদ্ধ বেরিল বর্ণহীন স্বচ্ছ, ঈষৎ ক্রোমিয়ম অক্সাইড প্রভৃতি থাকলে রং হয়। পান্না সবুজ, অ্যাকোআমেরিন ফিকে সবুজ বা নীলাভ সবুজ। দ্বিতীয়টি উপরত্ন, দাম পান্নার চেয়ে অনেক কম। রাজপুতানায় কিষনগড়ে, মাদ্রাজ প্রদেশে নেল্লোর ও কইম্বাটুর জেলায়, এবং কাশ্মীরে অ্যাকোআমেরিন পাওয়া যায়, কিন্তু পান্না বিরল।

উপরত্ন অনেক। যেগুলি বেশী প্রচলিত শুধু সেইগুলিরই বিবরণ দিচ্ছি।

স্পিনেল (spinel, সৌগন্ধিক, হিন্দী—নরম) স্বচ্ছ, নানা বর্ণের হয়, সাধারণত লাল, প্রায় চুনির তুল্য, কঠোরতা চুনি নীলার চেয়ে কম, উপাদান ম্যাগনিশিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম অক্সাইড। বর্মা ও সিংহলে পাওয়া যায়। লাল স্পিনেল অনেক সময় চুনি নামে চলে। আজকাল নানা বর্ণের কৃত্রিম স্পিনেলও তৈরি হচ্ছে।

বৈদূর্য (chrysoberyl) এর উপাদান বেরিলিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম অক্সাইড। কঠোরতা স্পিনেলের চেয়ে বেশী, চুনি নীলার চেয়ে কম। এই মণি নানা বর্ণের হয়, যা বেশী প্রচলিত তার নাম বিড়ালাক্ষ (cat's eye) বা লসুনিয়া। দেখতে বেরালের চোখের মতন ঈষদচ্ছ হরিতাভ পিঙ্গল বা রসুনের কোষের তুল্য। গোলপৃষ্ঠ ক'রে কাটলে মাঝে একটি উজ্জ্বল সাদা রেখা দেখা যায়, বিভিন্ন দিক্ থেকে দেখলে বোধ হয় রেখাটি নড়ছে। বাগ্‌ভটে আছে—'ভ্রমচ্ছুভ্রোত্তরীয়েণ গর্ভিতম্,' অর্থাৎ গর্ভে শুভ্র উত্তরীয় ভ্রমণ করে। সিংহলে এই মণি পাওয়া যায়।

পোখরাজ (পুষ্পরাগ, topaz) এর উপাদান অ্যালিউমিনিয়ম ফ্লুওসিলিকেট। স্বচ্ছ, বর্ণহীন বা হলদে, কঠোরতা স্পিনেলের সমান। সিংহল, বর্মা ও ব্রাজিল থেকে আসে।

গোমেদ (zircon) এর উপাদান জারকোনিয়ম সিলিকেট। এই মণি অত্যন্ত উজ্জ্বল, প্রায় হীরের মতন। স্বচ্ছ বর্ণহীন, এবং সবুজ, হলদে, নারাঙ্গী, পিঙ্গল প্রভৃতি নানা বর্ণের হয়। কঠোরতা পান্নার তুল্য। নারাঙ্গী বা রক্তপীত গোমেদ (hyacinth, jacinth) এর আদর বেশী। এদেশে গ্রহদোষ-শান্তির

আশায় গোমেদ নামে যা আংটিতে পরা হয় তা একরকম গারনেট (hessonite, cinnamon stone)। এইসব মণি সিংহলজাত।

ওপাল (opal) এর উপাদান অকেলাসিত সিলিকা ও তার সঙ্গে কিছু জল। ওপাল ঈষদচ্ছ বা অনচ্ছ, নানারকম হয়, বিচিত্রবর্ণ ওপালই বেশী চলে। কঠোরতা কম, প্রায় কাচের তুল্য। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে।

তামড়ি (সংস্কৃত — তাম্র) বা গারনেট (garnet) উপাদানভেদে বহুপ্রকার। এদেশে রত্নরূপে যা চলে তা ১১-প্রকরণে উক্ত অ্যালামাণ্ডাইট। কঠোরতা প্রায় পান্নার তুল্য। খুব উজ্জ্বল, রং গাঢ় লাল, একটু বেগনী আভা আছে। আংটির জন্য গোলপৃষ্ঠ ক'রে কাটা হ'লে এই মণিকে carbuncle বলা হয়। রাজপুতানায় জয়পুরে ও কিষনগড়ে পাওয়া যায়।

পেরিডট (peridot, olivine, পুত্তিকা, হিন্দী—জবরজদ) স্বচ্ছ, পুঁইশাকের মতন সবুজ, কঠোরতা স্ফটিকের চেয়ে কিছু কম। উপাদান লৌহ-ম্যাগনেসিয়ম সিলিকেট। বিহারে, রাজপুতানায় এবং মাদ্রাজ প্রদেশে পাওয়া যায়।

চন্দ্রকান্ত (moonstone) এর উপাদান ফেল্ড্স্পার, যার কথা ৯-প্রকরণে বলা হয়েছে। এই মণি বর্ণহীন স্বচ্ছ, কিন্তু ভিতরে অল্প ঘোলা আকাশবর্ণ দেখা যায়। কঠোরতা স্ফটিকের চেয়ে কম। সিংহলে পাওয়া যায়। সংস্কৃত কবিরা মনে করতেন চন্দ্রকিরণে এথেকে জলক্ষরণ হয়।

জেড (jade, সংস্কৃত—পীলু, হিন্দী—যশম) অনচ্ছ বা ঈষদচ্ছ, নানা বর্ণের হয়, সাধারণত বিচিত্রিত ফিকে সবুজ। কঠোরতা স্ফটিকের চেয়ে কিছু কম, কিন্তু আরও ঘাতসহ, সহজে ভাঙে না। দুই বিভিন্নজাতীয় পাথরকে জেড বলা হয় — জেডাইট (jadeite, সোডিয়ম-অ্যালিউমিনিয়ম সিলিকেট) এবং নেফ্রাইট (nephrite, ক্যালসিয়ম-ম্যাগনিশিয়ম-লৌহ সিলিকেট)। বর্মার উত্তর সীমায় পাওয়া যায়। এদেশে আর একরকম পাথর জেড বা যশম বা জহরমুহরা নামে চলে — বাওয়েনাইট (bowenite, সারপেন্টাইন জাতীয়), যুক্তপ্রদেশে মির্জাপুর অঞ্চলে, কাশ্মীরে, এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাওয়া যায়। এদেশের

অনেকের, বিশেষত পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশবাসীর বিশ্বাস — জহরমুহরা ধারণ করলে শুভ হয় এবং বিষপদার্থ নিকটে এলে এই পাথর বিবর্ণ হয়ে ধারয়িতাকে সতর্ক করে।

স্ফটিক (rockcrystal, হিন্দী—বিল্লৌর) বিশুদ্ধ কেলাসিত সিলিকা বা কোঅর্ট্‌স। কঠোরতা গারনেটের চেয়ে কম, সাধারণত বর্ণহীন স্বচ্ছ, একটু ম্যাংগানিজ থাকলে বেগনী রং হয়, তখন নাম হয় — জামীরা (রাজাবর্ত, amethyst)। একটু লৌহ অক্সাইড থাকলে হলদে হয়, নাম — সোনেলা (false topaz)। মধ্যপ্রদেশ ছিন্দোআরায় এবং জব্বলপুরের কাছে জামীরা ও সোনেলা পাওয়া যায়। বর্ণহীন স্ফটিক মাদ্রাজ প্রদেশে তাঞ্জোর জেলায়, পাঞ্জাবে কালাবাগ এবং মারি অঞ্চলে এবং ভারতের আরও কয়েক জায়গায় পাওয়া যায়। স্ফটিক কেটে চশমার পরকলা তৈরি হয়, কিন্তু আজকাল বেশী চলন নেই। স্ফটিকনির্মিত প্রাচীন কৌটো এদেশে অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে।

৭-প্রকরণে একরকম সিলিকার কথা বলা হয়েছে যার কেলাস প্রচ্ছন্ন। এই-প্রকার সিলিকা যখন স্বচ্ছ বা ঈষদচ্ছ এবং রঙিন বা সুদৃশ্য রেখান্বিত হয় তখন উপরত্নরূপে চলে। সাধারণ নাম ক্যালসিডনি (chalcedony)। এই পাথরের অনেক রূপভেদ আছে। কারনেলিয়ান (carnelian, রুধিরাখ্য) — প্রায় স্বচ্ছ, রক্তবর্ণ। অ্যাগেট (agate, হিন্দী—অকীক) — ঈষদচ্ছ, স্তরময়, রেখান্বিত, সাদা ধূসর আপিঙ্গল প্রভৃতি বর্ণের। ওনিক্স (onyx, হিন্দী—সুলেমানী) — এক বর্ণের উপর অন্য বর্ণের স্তর বা রেখা যুক্ত। এইসব পাথরের কঠোরতা প্রায় স্ফটিকের সমান, কিন্তু ঘাতসহতা বেশী। প্রধানত গুজরাটে রাজপিপলায় ও কাম্বেতে এবং মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়।

বর্ণক্রমসূচী

৷ ১৩৫০ ৷

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫ বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬ রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭, জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

৷ ১৩৫১ ৷

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ